ত্রৈমাসিক
আমিষ বার্তা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

জাটকা ধরা বন্ধ হলে ইলিশ উঠবে জাল ভরে

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৫

২৫ চৈত্র ১৪৩১- ১ বৈশাখ ১৪৩২
৮-১৪ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিষ্টাব্দ

জনসচেতনতায়: মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক
||| আমিষ বার্তা |||
* ১ম বর্ষ
* ২য় সংখ্যা
* মাঘ-চৈত্র ১৪৩১
জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫

সম্পাদকীয়

সকলের জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিত করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন দপ্তর-সংস্থা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া এই খাতকে টেকসই ও সমৃদ্ধ করতে সরকার বিভিন্ন যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করছে। বিশেষকরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উৎপাদন বাড়াতে, নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করতে সরকার চাষি ও খামারিদেরকে কৃষি ঋণ সুবিধা প্রদানের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাবছে। এছাড়া প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়নের জন্য মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সেবা আরও সম্প্রসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে দেশব্যাপী ৪৬৬টি উপজেলায় এই সেবা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার। প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি জনসাধারণের মাঝে প্রাণিজপুষ্টি পৌঁছে দেওয়ার কার্যক্রমও গ্রহণ করেছে সরকার। এরই অংশ হিসেবে এবার রমজান মাসে দেশের প্রান্তিক মানুষ, বিশেষকরে জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানে যারা জীবন বাজি রেখেছিল তাঁদের মাঝে সুলভমূল্যে মাংস, ডিম ও দুধ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং রাজধানী ঢাকাসহ দেশের আটটি বিভাগে এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়। তাছাড়া সরকার মৎস্য খাতকে সমৃদ্ধ করতে নারী মৎস্যজীবীদের নিবন্ধনের আওতায় আনার নানান পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। মৎস্য খাতের উৎপাদন বাড়াতে ও উৎপাদন প্রক্রিয়াকে টেকসই করতে সরকার সাগর, নদী ও অভয়াশ্রমগুলোতে নির্দিষ্ট মেয়াদে মাছ ধরার ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেছে। পাশাপাশি প্রাণিজ আমিষের অন্যতম উৎস মাছকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে মুখরোচক খাবার হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে মাছের ভ্যালু অ্যাডেড ফুড তৈরিতেও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বিশেষকরে সরকারের সহায়তায় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক মাছের সিঙারা, মাছের মোগলাই, ফিশ রোল, ফিশ বল, ফিশ ফিঙ্গার, ফিশ কাবাব ও মাছের চানাচুর ইত্যাদি তৈরি করেছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের নানামুখী কার্যক্রম গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন বেকারত্ব হ্রাস পেয়ে তৈরি হচ্ছে কর্মসংস্থান, অন্যদিকে দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মিটছে। ফলে সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠনে ভূমিকা রাখছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত। পাশাপাশি দেশও উন্নতির দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

এবারের আমিষ বার্তায় প্রকাশিত হয়েছে জনসাধারণ তথা চাষি ও খামারিদের জন্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের সংবাদ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে খামারি-চাষিদের সফলতার গল্প, গবেষকদের উদ্ভাবন এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের নানা প্রবন্ধ।

আশা করি প্রকাশিত লেখাগুলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নয়নের ধারাকে আরো গতিশীল করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
উম্মে হাবিবা
উপপরিচালক

সম্পাদক
ডা. মনিরুজ্জামান তরফদার
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
ও
মাহবুবা খানম
তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য)

সার্বিক সহযোগিতায়
মো. সামছুল আলম
গণযোগাযোগ কর্মকর্তা
ও
ইয়াসমিন আক্তার
অনুবাদক

প্রচ্ছদ
নুসরাত মমতাহিনা
সহকারী চিত্রশিল্পী

যোগাযোগ
প্রকাশনা ও সম্পাদনা শাখা
০২-৫৫০১২৮০৫
০২-৫৫০১২৮০৬
০২-৫৫০১২৮০৭
০২-৫৫০১২৮১১

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা

ই-মেইল
flidmofl@gmail.com
iol@gmail.com
iof@gmail.com

ওয়েবসাইট
www.flid.gov.bd

সূচিপত্র

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ব্যাংকের কথা ভাবছে সরকার: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	০৩
বিএফডিসি এবং জাপানের জেডিসি-কোনইক জয়েন্ট ভেঞ্চারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর	০৩
গবাদিপশুর ম্যাসটাইটিস ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন করলেন বাকৃবির অধ্যাপক	০৪
রমজানে সুলভ মূল্যে প্রায় অর্ধকোটি প্রান্তিক মানুষ পেয়েছে মাংস, ডিম ও দুধ	০৫
আধা নিবিড় চিংড়ি চাষে কোটিপতি আনারুল	০৬-০৭
পাহাড়ে অসহায়দের স্বাবলম্বী করতে বিজিবির হাঁসের খামার	০৭
মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল অর্জন: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	০৮
মহিষের বাণিজ্যিক খামারে দ্বিগুণ লাভে ভাগ্য বদলাচ্ছে খামারিদের	০৯-১০
সকলের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে কাজ করতে হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	১০
লাইভ জিন ব্যাংক খাবারের পাতে ফিরিয়ে আনছে দেশি মাছের স্বাদ	১১-১২
শখের ছাগলে স্বাবলম্বী মোকলেছার, কিনছেন গাভী ও জমি	১৩-১৪
কারেন্ট জাল নিয়ন্ত্রণে অভিযান পরিচালনা করে বা কাউকে শাস্তি দিয়ে সমস্যা সমাধান করা যাবে না: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	১৪
যমুনার চরে ভেড়া পালন করে স্বাবলম্বী নারীরা	১৫-১৬
আবারও পাতে ফিরবে সুস্বাদু গোটালি	১৬
বগুড়ার নারী উদ্যোক্তার গরুর মাংসের আচার এখন বিশ্ববাজারে	১৭
পাঁচ অভয়াশ্রমে মাছ ধরায় দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা	১৮
কই মাছের কৃত্রিম প্রজনন করার সহজ কৌশল	১৯-২০
নতুন জাতের বাউ মুরগি পালনে স্বপ্ন বুনছেন খামারিরা	২০
মাছের উচ্ছিস্ট থেকে হাজার কোটি টাকা আয়ের হাতছানি	২১-২২
নারী মৎস্যজীবীদের নিবন্ধন হালনাগাদে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	২২
মাছের অব্যবহৃত অংশ থেকে তৈরি হচ্ছে খাদ্য দ্রব্য	২৩
বিএলআরআই উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভ্যাকসিন সিড প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর	২৩-২৪
মহিষের দইকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান	২৪
কানের দুল বিক্রির টাকায় নাজমার খামার, মাসে আয় লাখ টাকা	২৫
গবাদিপশু পালনে সবুজ ঘাসের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত র‍্যালি	২৬
মুক্তা চাষে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা	২৭-২৮
কাঁকড়ায় বেকারত্ব নিরসন ও বৈদেশিক মুদ্রার সম্ভাবনা	২৯-৩০
ইফতারিতে মাছের শিঙাড়া-সমুচা আনল বিএফডিসি	৩০
জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: গবাদি প্রাণীর জন্য কী অপেক্ষা করছে	৩১-৩২
মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রাণিস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা	৩২

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ব্যাংকের কথা ভাবছে সরকার: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, দাদন থেকে মৎস্যজীবী ও খামারিদের বাঁচাতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন ব্যাংকের কথা ভাবছে সরকার। গবাদিপশু পালনকারীদের কৃষি ঋণ সুবিধার আওতায় অন্তর্ভুক্ত করতে চায় সরকার। মঙ্গলবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে ডিসি সম্মেলনের তৃতীয় দিনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধিবেশন শেষে তিনি সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, জাল যার জলা তার নীতি অনুসরণ করে প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সরকারি জলমহাল ইজারা দেওয়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে ডিসিদের। জলমহালগুলো অমৎস্যজীবীরা ইজারা পাবেন সেটা হবে না। প্রকৃত মৎস্যজীবীরা পেলে উপকৃত হবেন। এসব ইজারা বিষয়ে ডিসিদের বড় ভূমিকা থাকে, আমরা নির্দেশ দিয়েছি তারা যেন সেটা ঠিকভাবে করেন।
তিনি আরও বলেন, মা ইলিশ ও জাটকা সংরক্ষণ অভিযান এবং অবৈধ জাল ও ফিশিং গিয়ারের ব্যবহার বন্ধে অভিযান জোরদার করতে বলা হয়েছে। এছাড়া কারেন্ট জালসহ অবৈধ জাল ও ফিশিং গিয়ার তৈরি, বিপণন ও বাজারজাত বন্ধ করায় অভিযান জোরদার করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জলাশয় পুনঃখনন, অভয়াশ্রম ও বিল নার্সারি স্থাপনে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছে।
ফরিদা আখতার বলেন, উপজেলা পরিষদের বাজেটে প্রাণিসম্পদ খাতের জন্য নির্দিষ্ট বরাদ্দ নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকায় গবাদিপশু চোরাচালান বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। কোরবানির হাট ব্যবস্থাপনায় ভেটেরিনারি টিমকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও হাটে প্রাণিকল্যাণ আইন মেনে চলা নিশ্চিত করতে পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে।
সূত্র : দৈনিক যুগান্তর

বিএফডিসি এবং জাপানের জেডিসি-কোনইক জয়েন্ট ভেঞ্চারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর

জাপানের টোকিওস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসে বুধবার (২৯ জানুয়ারি) 'কক্সবাজার জেলায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের (বিএফডিসি) ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার উন্নয়ন প্রকল্প' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিএফডিসি এবং জেডিসি-কোনইক জয়েন্ট ভেঞ্চারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। জাপান সরকারের অনুদান সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।
চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে জাপানে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মো. দাউদ আলী উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বাংলাদেশের উন্নয়নে অব্যাহত সমর্থন ও সহযোগিতার জন্য জাপান সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। জাপানকে বাংলাদেশের একক বৃহত্তম উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে উল্লেখ করে রাষ্ট্রদূত বলেন, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি, অবকাঠামো, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও মানবসম্পদ উন্নয়নসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা ক্রমান্বয়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ভবিষ্যতে দু'দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
উল্লেখ্য ২০২৪ সালের ২৮ মার্চ ইআরডি এবং জাইকার মধ্যে কক্সবাজার ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টার উন্নয়নের জন্য ২.২৯৪ বিলিয়ন জাপানি ইয়েনের (বাংলাদেশি টাকায় ১৬৮.৩১ কোটি টাকা) একটি অনুদান চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে কক্সবাজার ফিশ ল্যান্ডিং সেন্টারে আধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধা যুক্ত হবে এবং মৎস্য অবতরণের সক্ষমতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।
বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বিএফডিসি'র চেয়ারম্যান সুরাইয়া আখতার জাহান। তিনি বাংলাদেশের মৎস্য খাতের উন্নয়নে জাপানের অব্যাহত সহযোগিতা কামনা করেন।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দূতাবাসের ইকনমিক মিনিস্টার সৈয়দ নাসির এরশাদ। সূত্র : বিএফডিসি

আমিষেই শক্তি, আমিষেই মুক্তি

মাছ চাষে দিলে মন
দেশের হবে উন্নয়ন

গবাদিপশুর ম্যাসটাইটিস ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন করলেন বাকৃবির অধ্যাপক

গবাদিপশুর ম্যাসটাইটিস রোগ বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুতর সমস্যা। এটি সাধারণত গাভী বা মহিষের স্তনে সংক্রমণের কারণে ঘটে, যা স্তনের দুধ উৎপাদন কমিয়ে দেয় এবং গবাদিপশুর স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে। সম্প্রতি গবাদিপশুর ম্যাসটাইটিস বা ওলান প্রদাহ রোগের ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন ও মাইক্রোবায়োলজি এন্ড হাইজিন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. বাহানুর রহমান ও তাঁর গবেষক দল। চার বছরের গবেষণা শেষে দেশে প্রথমবারের মতো এই ভ্যাক্সিন উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছেন বলে জানান তিনি। অধ্যাপক বাহানুরের এই গবেষক দলে ছিলেন ড. মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ও বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নরত কয়েকজন শিক্ষার্থী। জানা যায়, গবাদিপশুর ম্যাসটাইটিস বা ওলান প্রদাহ মূলত গাভীর ওলানে সংঘটিত ব্যাকটেরিয়াজনিত সংক্রামক ব্যাধি। এ রোগে গাভীর ওলান ফুলে যায়, ওলানে জ্বালাপোড়াসহ ব্যথা অনুভূত হয় ও গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়। অধিক সংক্রমণে গাভীর দুধ উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। এতে খামারিরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে থাকেন। এই রোগের ব্যাকটেরিয়া প্রচলিত এন্টিবায়োটিক রেজিস্ট্যান্ট হওয়ায় প্রতিষেধক চিকিৎসায় কার্যকরী ফলাফল পাওয়া যায় না।

গবেষণার বিষয়ে ড. বাহানুর বলেন, '২০২০ সালে আমরা গবেষণাটি শুরু করি। আমরা ঢাকা, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনাসহ ৯টি জেলার ২০৯টি খামারে জরিপ পরিচালনা করি। জরিপে আমরা ৪৬% গাভীতে ম্যাসটাইটিসের সংক্রমণ খুঁজে পাই। মাঠ পর্যায় থেকে আমরা স্যাম্পল সংগ্রহ করে সোমাটিক সেল কাউন্টের মাধ্যমে ম্যাসটাইটিসের সংক্রমণ ও এর তীব্রতা নিরুপণ করি। পরবর্তীতে গবেষণাগারে দীর্ঘ ক্লিনিক্যাল টেস্ট ও প্রক্রিয়াকরণ শেষে আমরা এই ভ্যাক্সিন উদ্ভাবনে সক্ষম হই। ৫১৭টি গাভী থেকে নমুনা সংগ্রহ করে এই গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে। এই ভ্যাক্সিন তৈরিতে ৪টি ব্যাকটেরিয়া নিয়ে কাজ করেছি। ব্যাকটেরিয়াগুলো হলো- *Streptococcus agalactiae, Escherichia coli, Staphylococcus aureus* ও *Streptococcus uberis*। এই ব্যাকটেরিয়াগুলো গবেষণায় ব্যবহৃত নমুনা থেকেই সংগ্রহ করা হয়েছে। চারটি ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে বিধায় একে Polyvalent Mastitis Vaccine বলে। এই ব্যাকটেরিয়াগুলো জুনোটিক স্বভাবের কারণে প্রাণী থেকে মানুষেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। জানা যায়, বাংলাদেশ বিজ্ঞান একাডেমি-ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (বাস-ইউএসডিএ) প্রোগ্রামের অর্থায়নে ২০২০ সালের ১ অক্টোবর এই গবেষণাটি শুরু হয়ে ২০২৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর শেষ হয়। গবেষণাটির মেয়াদকাল ছিলো তিন বছর এবং এটি ২০২৪ সালের ১১ জুন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে উপস্থাপন করা হয়।

ড. বাহানুর বলেন, 'ভালো দুধ উৎপাদনে গাভীর ওলানের সুস্থতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মূলত ব্যাকটেরিয়া ও ক্ষেত্র বিশেষে কিছু ছত্রাকের আক্রমণে গাভীর এই রোগ হয়ে থাকে। দেশে পূর্বে এই রোগের ভ্যাক্সিন বিদেশ থেকে আমদানি করা হলেও বর্তমানে এই ভ্যাক্সিন দেশে আর পাওয়া যায় না। গাভীর সুস্থতা নিশ্চিত করতে ও দুধ উৎপাদন যাতে ব্যাহত না হয় সেই উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে আমরাই প্রথম ম্যাসটাইটিস ভ্যাক্সিনটি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছি।'

তিনি বলেন,'আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কোনো ভ্যাক্সিনের কার্যকারিতা ৭০ শতাংশ হলেই সেটি সফল হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু উদ্ভাবিত আমাদের ভ্যাক্সিনটি প্রায় শতভাগ কার্যকর। ভ্যাক্সিনটির ব্যবহারবিধি সম্পর্কে অধ্যাপক বাহানুর রহমান বলেন, 'উদ্ভাবিত ভ্যাক্সিনটি ইঁদুর ও গিনিপিগে প্রয়োগ করে এর নিরাপত্তা যাচাই করা হয়েছে এবং পঞ্চম প্রজন্মের এডজুভেন্ট এই ভ্যাক্সিনে ব্যবহার করা হয়েছে। ভ্যাক্সিনটি গাভীর গর্ভাবস্থায় প্রয়োগ করতে হয়। ভ্যাক্সিনটির দুইটি ডোজ গাভীকে দিতে হবে। প্রথম ডোজ গর্ভাবস্থার ৭ থেকে ৮ মাসের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ডোজ বাচ্চা হবার আগ মুহূর্তে অর্থাৎ ৯ থেকে সাড়ে ৯ মাসের মধ্যে দিতে হবে। প্রতি প্রাণীকে ৫ মিলি করে ভ্যাক্সিন প্রতি ডোজে দিতে হবে। এই ভ্যাক্সিনের কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই। ভ্যাক্সিনের দুইটি ডোজ গাভীকে দিয়ে দিলে ম্যাসটাইটিসে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রায় ৯০ শতাংশ কমে যাবে। বাজারজাত করা সম্ভব হলে এই ভ্যাক্সিনের দাম কৃষকের নাগালের মধ্যেই থাকবে। সূত্র : বিএলআরআই

রমজানে সুলভ মূল্যে প্রায় অর্ধকোটি প্রান্তিক মানুষ পেয়েছে মাংস, ডিম ও দুধ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উদ্যোগে এবং সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহযোগিতায় পবিত্র রমজান মাসে ঢাকাসহ দেশের ৮টি বিভাগীয় শহরে সুলভ মূল্যে প্রায় অর্ধকোটি প্রান্তিক মানুষ পেয়েছে মাংস, ডিম ও দুধ। যার বাণিজ্যিক মূল্য প্রায় ৩০ কোটি ১৫ লাখ টাকা।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, মাংস, ডিম, দুধ ইত্যাদি সরবরাহ ও মূল্য স্থিতিশীল রাখার উদ্দেশ্যে ১লা রমজান থেকে ২৮ রমজান পর্যন্ত ঢাকা শহরসহ দেশের ৮টি শহরে ড্রেসড্ ব্রয়লার, ডিম, পাস্তুরিত দুধ ও গরুর মাংস এবং সারাদেশে ব্রয়লার, ডিম, পাস্তুরিত দুধ, গরুর মাংস ও খাসির মাংস সুলভ মূল্যে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করেছে।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উপপরিচালক (খামার) মো. শরিফুল ইসলাম জানান, ৮ বিভাগে ৪৫,৭৬,৭৮৭ জন পুরুষ এবং ৩,১১,৭২৬ জন মহিলা ক্রেতার মধ্যে ৩০ কোটি ১৪ লাখ ৭৯ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি হয়েছে। ডিম ৫৯,০১,৬৩৬ টি, দুধ ৪,০১,৫১১ লিটার, ব্রয়লার ৫,৭৮,৮৬৮ কেজি, গরুর মাংস ২,২১,৯৫৬ কেজি বিক্রি হয়েছে। বাংলাদেশ ডেইরি এন্ড ফ্যাটেনিং ফারমার্স এসোসিয়েশনের (বিডিএফএফএ) সভাপতি মোহাম্মদ ইকবাল হোসাইন বলেন, আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রথমবারের মতো সরকারের এই কার্যক্রমে যুক্ত ছিলাম। নতুন হিসেবে আমাদের বেশ কিছু সমস্যার মধ্যদিয়ে যেতে হয়েছে। তার পরেও নানা প্রতিকূলতার মধ্য থেকে আমরা কাজ করছি। তবে তিনি আশা করেন মাংসের মূল্য কমাতে তারা বছর জুড়ে গরুর মাংস বিক্রি কার্যক্রম পরিচালনা করতে চান। এক্ষেত্রে সরকারি সহায়তা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। বাংলাদেশ ডেইরি এন্ড ফ্যাটেনিং ফারমার্স এসোসিয়েশনের (বিডিএফএফএ) সাধারণ সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, আমাদেরকে সরকারি খামার থেকে গরু সরবরাহ করা হয়েছিল। তার পরেও আমরা নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় গরুর মাংস সরবরাহ করেছি। তবে এবার যে সমস্যাগুলো ছিল তা আর আগামীতে থাকবে না। মন্ত্রণালয়ের সূত্রে জানায়, যে সকল স্থানে জুলাই বিপ্লবের সময় সাধারণ মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ বেশি ছিল সে সকল স্থানকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ১লা রমজান থেকে ঢাকা শহরের ২৫টি স্থানে সুলভ মূল্যে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্র চালু ছিল। গত ২৩ মার্চ ২০২৫ হতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বাজেটের আওতায় প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ নামে বিশেষ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ঢাকা শহরে অতিরিক্ত ২৩টি, নারায়ণগঞ্জ শহরে ৩টি এবং ৭টি বিভাগীয় দপ্তরে ১৪টি ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে ড্রেসড্ ব্রয়লার, ডিম, পাস্তুরিত দুধ ও গরুর মাংস বিক্রয় কার্যক্রমের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়েছিল।

এ কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সারাদেশে ডিম (প্রতি ডজন) ১০৮ টাকার স্থলে ১০০ টাকা, ড্রেসড্ ব্রয়লার মাংস (প্রতি কেজি) ২৫০ টাকা, দুধ পাস্তুরিত (প্রতি লিটার) ৮০ টাকা, এবং গরুর মাংস (প্রতি কেজি) ৬৫০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছিল।

সূত্র : কৃষি সংবাদ

আধা নিবিড় চিংড়ি চাষে কোটিপতি আনারুল

পরিবেশগত বিষয়াদি বিবেচনায় রেখে পরিবেশ বান্ধব 'আধা নিবিড়' চিংড়ি চাষ হচ্ছে উপকূলীয় জেলায়। গত ৮ বছর ধরে এ চাষ চললেও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব পড়ছে। তবে, ধৈর্য ধরে এ চাষে টিকে থাকায় সফলতার মুখ দেখছেন মো. আনারুল ইসলাম।

৮ বছর আগে সাতক্ষীরায় ১১ জন আধা নিবিড় চিংড়ি চাষ শুরু করেন। কিন্তু সরে গেছেন অনেকেই। ধৈর্য নিয়ে থাকায় ২০২৪ সালে আনারুল আধা নিবিড় চিংড়ি চাষ থেকে সাড়ে ৩৮ লাখ টাকা আয় করেন। তিনি খামার পরিচালনা করছেন দেবহাটায়।

চিংড়ি চাষে ৩৫ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আনারুল বলেন, 'চিংড়ি চাষে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের পরও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে ঘেরের পানির তাপমাত্রায় হঠাৎ পরিবর্তন আসে।'

তিনি জানান, চিংড়ি চাষে সরকার অনুমোদিত বৈধ উপকরণ ব্যবহার করে থাকেন। চিংড়ি উৎপাদনে তিনি কখনো গ্রোথ হরমোন বা এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করেন না। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে তিনি সর্বদা ভালো কোম্পানির মানসম্মত ফিড ব্যবহার করেন। তিনি ২০২৪ উৎপাদন বছরে বাগদা চাষে অভাবনীয় সফলতা পেয়েছেন। আনারুল দেবহাটা উপজেলার পারুলিয়া ইউনিয়নের রাঙ্গাশিসা গ্রামের আহছানিয়া ফিস বাগদা খামার পরিচালনা করেন।

আনারুলের বাড়ি দেবহাটা উপজেলার পারুলিয়া ইউনিয়নের রাঙ্গাশিসা গ্রামে। আহছানিয়া ফিস খামার নামে বাগদা চিংড়ি খামারের কার্যক্রমের আওতায় তার খামারে রয়েছে ১২টি পুকুর। খামারের আয়তন ৯ হেক্টর। যার জলায়তন ৪.৮০ হেক্টর। এটি একটি আধা নিবিড় বাগদা চিংড়ি খামার।

আনারুল জানান, ২০২৪ উৎপাদন বছরে খামারের ৪.৮০ হেক্টর জলাশয়ের ১২টি পুকুরে ৬১.২৫ মেট্রিক টন চিংড়ি উৎপাদন করেন। হেক্টর প্রতি ১২.৭৬ মে. টন বাগদা চিংড়ি উৎপাদন হয়। প্রতি হেক্টরে ব্যয় হয় ৭০.৮৩ লাখ টাকা, আয় করেছেন ১০৯ লাখ টাকা। ফলে হেক্টর প্রতি তিনি লাভ করেছেন ৩৮.৫৪ লাখ টাকা। মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর সূত্রে জানা যায়, খামারের খাদ্য নমুনায়ন করে এ পর্যন্ত নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো গ্রোথ হরমোন বা এন্টিবায়োটিক পাওয়া যায়নি। চিংড়ি নমুনায়ন করেও এ পর্যন্ত কোনো গ্রোথ হরমোন বা এন্টিবায়োটিক/কীটনাশক/নিষিদ্ধ কোনো কেমিক্যাল পাওয়া যায়নি। ঘের প্রস্তুতকালীন পরিবেশের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে বা নিষিদ্ধ কোনো কেমিক্যাল তিনি ব্যবহার করেননি।

দেবহাটা উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য অফিসার মো. আবুবকর সিদ্দিক জানান, উপজেলায় বর্তমান ৩টি আধা নিবিড় বাগদা খামার রয়েছে। আধা নিবিড় খামার বাড়ানোর জন্য চাষিদের উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। কারণ সনাতন পদ্ধতিতে যেখানে হেক্টর প্রতি মাত্র ৩৫০ কেজি বাগদা উৎপাদিত হয়, সেখানে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে হেক্টর প্রতি ১২ হাজার থেকে ১৫ হাজার কেজি বাগদা উৎপাদন সম্ভব। আনারুল ২০২৪ সালে সাড়ে ৩৮ লাখ টাকা লাভ করেছেন আধা নিবিড় চিংড়ি চাষ করে। যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সাড়া জাগানো খবর। এ ধরনের আধা নিবিড় পদ্ধতি অনুসরণ করে আশপাশের অনেক বাগদা চিংড়ি চাষি বাগদা চাষে উদ্বুদ্ধ হচ্ছেন। ফলে আধা নিবিড় বাগদা চিংড়ির খামার সম্প্রসারিত হচ্ছে। তিনি বলেন, আধা নিবিড় চিংড়ি চাষ প্রক্রিয়ার বিষয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যা মেনে চাষ করতে হয়। আর সাধারণ পদ্ধতির চিংড়ি চাষে এ ধরনের কোনো প্রক্রিয়া নেই।

দেবহাটা উপজেলা মৎস্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, দেবহাটা উপজেলায় ৪৫০ হেক্টর আয়তনের ৭৭৫টি গলদা ঘের রয়েছে। যার উৎপাদন ৮৮৯ মেট্রিক টন ও ৮,৮৯৩ হেক্টর আয়তনের ৭,৪৬৯টি বাগদা চিংড়ি ঘের রয়েছে। যার উৎপাদন ৩,৩৯০ মেট্রিক টন। অন্যদিকে মাত্র ১১ হেক্টর আয়তনের ৩টি আধা নিবিড় বাগদা খামার রয়েছে। যার উৎপাদন ১৪৩ মেট্রিক টন। দেবহাটা উপজেলায় মাছের ৪,৯৩৩ মেট্রিক টন চাহিদার বিপরীতে ১০,৪৮১ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়। অর্থাৎ ৫,৫৪৮ মেট্রিক টন মাছ বেশি উৎপাদিত হয়। মাছ ও চিংড়ি চাষে সমৃদ্ধ এ উপজেলা দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানিতেও ভূমিকা রাখছে।

সাতক্ষীরা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা জিএম সেলিম জানান, এ জেলায় ৫৪ হাজার ঘেরের ৫৮ হাজার হেক্টর জমিতে ২৬ হাজার মেট্রিক টন বাগদা ও ১১ হাজার ঘেরের ৯ হাজার হেক্টর জমিতে ১০ হাজার মেট্রিক টন গলদা চিংড়ি উৎপাদন হয়। এগুলো সাধারণ ঘের। পাশাপাশি ১১টি ঘেরে আধা নিবিড় পদ্ধতির চিংড়ি চাষ হয়। সেখানে হেক্টর প্রতি সর্বোচ্চ ৭ মেট্রিক টন ও সর্বনিম্ন ৩ মেট্রিক টন পর্যন্ত উৎপাদন হয়। কিন্তু এ চাষ পদ্ধতির শুরুতে খরচের পরিমাণ বেশি। আবার সাধারণ ঘেরের চেয়ে আধা নিবিড় পদ্ধতির চাষে উৎপাদন ৩-৪ গুণ বেশি। কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব আধা নিবিড় চিংড়ি চাষেও পড়ছে। তারপরও উৎপাদন অনেক বেশি।

তিনি বলেন, "আধা নিবিড় চিংড়ি চাষের ঘেরের গভীরতা ৫ ফিট করার কথা বললেও অনেকেই খরচের কারণে ৩ ফিট করে রাখেন। যা চাতুর্যময়। আবার অনাবৃষ্টির পর তাপ বেড়ে পানির তাপমাত্রায় পরিবর্তন হয়, অনেক বেড়ে যায়। এমন অবস্থায় হঠাৎ বৃষ্টিতে আবার পানির তাপমাত্রা মাত্রাতিরিক্ত কমে যায়।"

আধা নিবিড় চিংড়ি চাষ প্রক্রিয়া

➪ পানির গভীরতা ৫ ফিট করতে হয়।
➪ পুকুরের মাঝখানে কিছুটা গর্ত করে ফিস টয়লেট করতে হয়।
➪ পুকুরের চারপাশে ব্লু নেট দিয়ে ঘিরে দিতে হয়।
➪ মাইক্রো নেট দিয়ে ছেকে পুকুরে পানি প্রবেশ করাতে হয়।
➪ পানিতে লবণের মাত্রা ১০-২০ পিপিটি হতে হয়।
➪ প্রবেশকৃত পানি প্রতি শতাংশের প্রতি ফিট গভীরতার জন্য ৮০০ গ্রাম হারে বিচিং করাতে হয়।
➪ প্রিবায়োটিক ও প্রোবায়োটিক প্রয়োগ করে চিংড়ির প্রাথমিক খাদ্য ফাইটোপ্লাংকটন ও জুপ্লাংকটন তৈরি করতে হয়।
➪ রোগ মুক্ত এসপিএফ পিএল (রেণু পোনা) মজুদ করতে হয়।
➪ উচ্চ ঘনত্বে অর্থাৎ প্রতি শতাংশে ৬০০-১০০০টি পিএল মজুদ করা হয়। এ জন্য প্রয়োজন অনুসারে এরেটর স্থাপন করতে হয়।
➪ প্রয়োজন অনুসারে ৭-১০ দিন পরপর মিনারেলস প্রয়োগ করতে হয়।
➪ পানির পিএইচ ৭.৮-৮.১ এর মধ্যে ও অক্সিজেন ৫-৮ পিপিএম এর মধ্যে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।
➪ নিয়মিত উচ্চমান ও প্রোটিন সমৃদ্ধ খাবার দিতে হয়। খাবার কেমন খাচ্ছে এ জন্য ফিড ট্রে ব্যবহার করতে হয়।
➪ নিয়মিত চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে রেকর্ড সংরক্ষণ করা হয়।

সূত্র : দৈনিক ঢাকা ট্রিবিউন

খাদ্য, অর্থ, কর্ম মিলে
মাছের চাষে যোগ দিলে

পাহাড়ে অসহায়দের স্বাবলম্বী করতে বিজিবির হাঁসের খামার

পাহাড়ি জেলা রাঙ্গামাটি লংগদুতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন ও মানবিক সহায়তার ধারাবাহিকতায় তিনটি অসহায় দরিদ্র পরিবারকে স্বাবলম্বী করতে হাঁস, হাঁসের শেড, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদান করেছে রাজনগর ৩৭ বিজিবি জোন। বিজিবি জোনের উদ্যোগে ও রাঙ্গামাটি সেনা রিজিয়নের দিকনির্দেশনায় এবং জোন অধিনায়ক লে. কর্নেল নাহিদ হাসানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে এই সহায়তা প্রদান করা হয়। সহকারী পরিচালক নাজমুল হোসেন জোনের অন্যান্য কর্মকর্তাদের সঙ্গে উপস্থিত থেকে তিনটি পরিবারের মাঝে পঞ্চাশটি করে হাঁস, হাঁসের শেড, খাদ্য ও ওষুধ সামগ্রী হস্তান্তর করেন।

জোন অধিনায়ক নাহিদ হাসান বলেন, দূর্গম পাহাড়ে বসবাসরত দরিদ্র পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানো আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। আমরা চাই, তারা যেন স্বাবলম্বী হতে পারে এবং দরিদ্র্যতা থেকে মুক্তি পায়। ভবিষ্যতেও এমন মানবিক সহায়তা অব্যাহত থাকবে। সহায়তা পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন উপকারভোগী পরিবার। তারা বলেন, বিজিবির এই উদ্যোগ আমাদের জীবনে নতুন আশার আলো দেখিয়েছে। হাঁস পালনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পাবো।

রাজনগর ৩৭ বিজিবি জোন সূত্রে জানা গেছে, পাহাড়ে বসবাসকারী পাহাড়ি বাঙালি সম্প্রদায়ের দরিদ্র পরিবারগুলোকে স্বাবলম্বী করতে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ নিয়মিত এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে যাচ্ছে। বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করে আর্থিক স্বচ্ছলতা নিশ্চিত করাই তাদের মূল লক্ষ্য।

বিজিবির এমন মানবিক উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও পরিবারকে এভাবে সহায়তা করার আহ্বান জানান স্থানীয় সচেতন নাগরিক। অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, হেডম্যান, কারবারীসহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। সূত্র : উত্তরাধিকার ৭১ নিউজ

সময়মতো টিকা দিলে
অর্থ, সম্পদ দুই মিলে

মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক বাংলাদেশের জন্য একটি বিশাল অর্জন: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের (এমভিসি) সেবা পৌঁছে দেয়ার আহ্বান জানিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এমভিসি একটি বড় অর্জন। তবে এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। ১৭ মার্চ (সোমবার) বিকালে মহাখালীস্থ প্রাণিসম্পদ গবেষণা কেন্দ্র (বিএলআরআই) প্রাঙ্গণে ১১৫টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক (এমভিসি) বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। উপদেষ্টা বলেন, এমভিসি গাড়ির মতো চার চাকা হলেও এটি গাড়ি নয়, এটি হচ্ছে একটি হাসপাতাল। যেখানে প্রাণী চিকিৎসার সকল কিছুই থাকছে। থাকছেন একজন সার্জনও। এসময়ে উপদেষ্টা প্রাণিসম্পদ অধিপ্তরের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্টদের উদ্দেশ্যে বলেন, এই সেবাটি প্রত্যন্ত খামারিদের কাছে পৌঁছাতে হবে। এর অন্য কোনো ব্যবহার যাতে না হয় এ দিকে নজর দিতে হবে। প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, অনেক সময় দেখা যায় বড় বা বাণিজ্যিক খামারগুলোকে আমরা সেবা দেই। এক্ষেত্রে তাদের সেবার পাশাপাশি গ্রামীণ এবং প্রত্যন্ত খামারিদের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা নিতে হবে। তারা যাতে এ সেবার বিষয়ে জানতে পারেন তারও উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি। মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিকের সেবাটি ফ্রি ও ভালো উদ্যোগ উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, গ্রামীণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক হলও আছে। এখন থেকে প্রাণীর সেবায় চালু হচ্ছে এমভিসি। তবে এটির সেবা নিশ্চিত করার জন্য ভেটেরিনারি ডাক্তারদের সচেতন এবং সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, মানুষের নিরাপদ আমিষ নিশ্চিত করতে এই ভেটেরিনারি ক্লিনিক বা 'প্রাণীর পাশেই ডাক্তার' এর গুরুত্ব বেশি। কোনো প্রাণী অসুস্থ্য হলে তার আশ পাশের অনেক প্রাণীও অসুস্থ হতে পারে। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে সব প্রাণীর সেবা নিশ্চিত করতে হবে। যাতে করে অসুস্থ্য প্রাণী বাজারে আসতে না পারে। হাঁস-মুরগি থেকে সকল গবাদিপশু ও পাখির সেবা নিশ্চিত করতে হবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে আরও বক্তৃতা করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নিলুফা আক্তার, মৎস্য অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রশাসন) ডা. মো. বয়জার রহমান, প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক ডা. মো. জসিম উদ্দিন, শৈলকূপা সম্মিলিত খামারি পরিষদ ও কৃষক ফেডারেশনের মুখপাত্র মো. তানজীর আলম রবিন, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বিভিন্ন প্রকল্পের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও পরামর্শক, প্রাণিসম্পদ খাতের বিজ্ঞানী-গবেষক, উদ্যোক্তা এবং মোবাইল ভেটেরিনারি ক্লিনিক সেবা গ্রহণকারী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও চালকগণ অনুষ্ঠানে এসময় উপস্থিত ছিলেন। এরপূর্বে এমভিসির ওপর নির্মিত একটি টিভি বিজ্ঞাপন, একটি প্রামাণ্যচিত্র ও একটি সাফল্যগাঁথা প্রদর্শন করা হয়। উল্লেখ্য, 'প্রাণীর পাশেই ডাক্তার' এই থিম-কে ধারণ করে প্রান্তিক খামারিদের দোরগোড়ায় আধুনিক ও জরুরি প্রাণিচিকিৎসা সেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) হতে তৃতীয় ও শেষ ধাপে আরও ১১৫টি এমভিসি অবশিষ্ট উপজেলাতে বিতরণ করা হয়। এ নিয়ে ৪৬৬টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরে এমভিসি বিতরণ করা হলো।

লেখক: মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মনের মতো চিকিৎসা পেলে, খামার করবো হেসে খেলে

মহিষের বাণিজ্যিক খামারে দ্বিগুণ লাভে ভাগ্য বদলাচ্ছে খামারিদের

তিনটি গাভী ও তিনটি বাচ্চা মহিষ দিয়ে বাণিজ্যিকভাবে শুরু করা মহিষের খামারে ভাগ্য বদলেছে পাবনার হেমায়েতপুর ইউনিয়নের ভগীরথপুরের রাসেল ব্যাপারীর। দ্বিগুণ লাভে তিন বছরে তার খামারে এখন ১৫টি গাভী ও ১০টি বাচ্চা মহিষ রয়েছে। এর মাঝে প্রায় লাখ টাকা দামে বিক্রি করেছেন ৭টি মহিষের বাচ্চা। মহিষের গাড়ি চালিয়ে ও চাষ করে সংসার না চলা রাসেলের সংসারে এখন সুখের বন্যা। তাকে দেখে অনেকেই ঝুঁকছেন মহিষের এ বাণিজ্যিক খামারে। রাসেল ব্যাপারী জানান, সবজি চাষ ও মহিষের গাড়ি চালাতেন তিনি ও তার বাবা। দিনরাত হাড়ভাঙা পরিশ্রমেও সংসার চালানো দায় ছিল তাদের। পার্শ্ববর্তী জেলা নাটোরের লালপুরে মহিষের খামার দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ২০১৯ সালে ৭ লাখ টাকায় বাচ্চাসহ ৬টি মহিষ নিয়ে শুরু করেন খামার। এখন সেটি সম্প্রসারণে ভাগ্য বদলেছে তাদের। বছরজুড়েই অন্তত ৫ থেকে ৭টি মহিষ ৩ থেকে ৪ কেজি করে দুধ দেয়। এ দিয়েই খামারের মহিষের খাবারসহ অন্যান্য ব্যয় মিটে যায়। গরু বা অন্যান্য গবাদি পশুর তুলনায় রোগবালাই ও লালনপালনে খরচ কম হওয়ায় তেমন বিনিয়োগ ছাড়াই ব্যাপক লাভে রাসেলের খামার। রাসেল বলেন, এখন আমার খামারে ছোটবড় মিলিয়ে ২৫টি মহিষ আছে। ৬টি মহিষ দুধ দিচ্ছে। প্রতিদিন ১৫ থেকে ১৮ কেজি দুধ পাচ্ছি। ৭০ থেকে ৮০ টাকা কেজি দরে এ দুধ বিক্রি হয়। একটি মহিষ গড়ে ৬ থেকে ৭ মাস দুধ দেয়। খাবারসহ গড়ে একটি মহিষের পেছনে দিনে ১০০ টাকার কম খরচ হয়। তবে আমাদের এতো খরচ হয় না, কারণ বিভিন্ন মাঠের ও জমিতে লাগানো ঘাস খাওয়ানোর ফলে খরচ অনেক কম হয়। এরপর প্রতিবছর মহিষ প্রতি একটা বাচ্চা আমাদের লাভ থাকে। বাচ্চাগুলো ৮০ হাজার থেকে লাখ টাকায়ও বিক্রি হয়। তিনি বলেন, সবজিসহ অন্যান্য চাষে সংসার চালাতে পারছিলাম না। মহিষের গাড়ি বেয়েও কূলকিনারা পাইনি। বছরে ঘর নষ্ট হলে একটা টিন লাগাতে খুব হিসাব করতে হতো। এখন এই খামার করে অভাব ঘুচেছে। জমি কিনেছি, বাড়িঘরও ঠিক করেছি। গত এক দশকে মাংস ও দুধের ক্রমবর্ধমান চাহিদায় মহিষের বাজারমূল্য বেড়েছে কয়েকগুণ। বাণিজ্যিক সফলতায় ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা থেকে অনেকেই এখন পুরোদস্তুর খামারি। এই খামার করে শুধু রাসেল ব্যাপারী নয়, পাবনার জয়নাল প্রামাণিক, ফরিদ ও মনি ব্যাপারীসহ কয়েকটি উপজেলার অন্তত ৩০ থেকে ৪০ জনের ভাগ্য বদলেছে। দুই থেকে তিন বছরে খামারের পরিসর বেড়ে হয়েছে দ্বিগুণ। খামারি জয়নাল প্রামাণিক জানান, ২৬ থেকে ২৮ লাখ টাকায় ২২টি মহিষ কিনে খামার শুরু করি। লালন পালনের সময় একটি মহিষ মারা যায়। এ পর্যন্ত তিনটি মহিষ বিক্রি করেছি। তিন বছর পর এখন আমার খামারে ৪৫টি মহিষ রয়েছে। এদের দেখভালে আপাতত তিনজন রাখাল রাখা আছে। এবার এর সংখ্যা বাড়াতে হবে। পাশেই পদ্মার চর। এখান থেকে ঘাসের বড় একটি চাহিদা মিটে যায়। বাকিটা রোপণ করা ঘাস ও অল্প খৈল ভুসিতে মেটে। সবমিলিয়ে গরু বা অন্যান্য গবাদিপশুর তুলনায় মহিষ পালনে খরচ অনেক কম। তিনি বলেন, একটি মহিষ বছরে একটি বাচ্চা দেয় এবং ৬ থেকে ৮ মাস অবধি দুধ দেয়। এ দিয়ে নিজেদের দুধের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি বিক্রি করে মহিষ পালনের খরচ উঠে যায়। এর মধ্যে খামার থেকে বছরে ২০টি বাছুর পেলে প্রায় ২০ লাখ টাকা লাভ হয়।

মহিষের বাণিজ্যিক খামারে দ্বিগুণ লাভে ভাগ্য বদলাচ্ছে খামারিদের। রোগ-বালাইয়ের ব্যাপারে তিনি বলেন, মহিষের রোগবালাই কম। তবে একেবারে হয় না, তা নয়। একটি মহিষ মারা গেলে প্রায় দেড় দুই লাখ টাকা শেষ। এদিক থেকে সচেতন থাকতে হয়। এর পাশাপাশি সরকারি পশু চিকিৎসকরা একটু সহযোগিতা করলে ভালো হয়। বাণিজ্যিকভাবে মহিষ পালনে শুধু খামারিদের ভাগ্য বদলায়নি, সৃষ্টি হয়েছে ব্যাপক কর্মসংস্থানের। অধিকাংশ বড় খামারগুলোতে দুই থেকে পাঁচজন লোক কাজের সুযোগ পাচ্ছেন। মহিষ দেখভালের দায়িত্বে থাকা রাখাল সাগর বলেন, সকালে দুধ দোহানো শেষে মাঠে আনি। সারাদিন মাঠে

ঘাস খাওয়াই। দিনে ৪ থেকে ৫ বার নদীতে নিয়ে ডুবিয়ে (গোসল) রাখতে হয়। গরমের দিনে অর্ধেক দিন খাওয়াতে হয়, আর অর্ধেক দিন পানিতে রাখতে হয়। তিনি বলেন, এখনতো মহিষ পালনে খরচ নেই বললেই চলে। তবে বর্ষাকালে যখন মাঠঘাট পানির নিচে থাকে, তখন ঘাসের সংকট হয়। এসময় উঁচু জমিতে ঘাস চাষ করে খাওয়াতে হয় এবং খৈল, ভুসিও বেশি লাগে। আরেক রাখাল খায়রুল বলেন, আগে ইটের ভাটায় কাজ করতাম। গাধার মতো খাটতে হতো। শরীরের কিছু থাকতো না। এখন এসব খামার হওয়ায় আমাদের কাজের সুযোগ হয়েছে। এই কাজে পরিশ্রম কম। ১৫ হাজার টাকা বেতন পাই। এ দিয়ে সংসার চলে। মহিষের বাণিজ্যিক খামারে দ্বিগুণ লাভে ভাগ্য বদলাচ্ছে। খামারিদের জেলা প্রাণিসম্পদ বিভাগের তথ্য বলছে, ৫ বছর আগেও এ জেলায় মহিষের সংখ্যা ছিল মাত্র ৭ হাজার। বাণিজ্যিক খামার তেমন দেখা যেত না। শুষ্ক মৌসুমে চারণভূমি, জলাধার ও গোখাদ্যের সহজলভ্যতায় জেলার চরাঞ্চলে বাণিজ্যিকভাবে মহিষ পালনে আগ্রহী হচ্ছেন খামারিরা। বর্তমানে জেলায় ৬৬টি খামারে প্রায় ২২ হাজার মহিষ লালন পালন হচ্ছে। এবছর ৬০৫টি মহিষের প্রজনন করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা একেএসএম মুশারফ হোসেন বলেন, জেলার সদর, ঈশ্বরদী, সুজানগর, সাঁথিয়া, বেড়া ও চাটমোহরে বাণিজ্যিকভাবে মহিষ পালন বেশি হচ্ছে। এক্ষেত্রে গলাফুলা ও কৃমিনাশক-এর টিকা প্রদানসহ আমরা প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা করছি। মহিষের প্রজননে প্রতি উপজেলায় একজন করে দক্ষ টেকনিশিয়ান রাখা হয়েছে। এছাড়া মাঠকর্মীদের মাধ্যমে এ খামার সম্প্রসারণে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়া হচ্ছে। এ অঞ্চলে পর্যাপ্ত চারণভূমি থাকায় বাণিজ্যিকভাবে মহিষ পালন দ্রুত বড় ধরনের একটি সফলতা বয়ে আনবে। সূত্র : জাগো নিউজ ২৪ ডট কম

সকলের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে কাজ করতে হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, সকলের জন্য নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণে কাজ করতে হবে। বাংলাদেশ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদে সমৃদ্ধ। এখানে অনেক রিসোর্স আছে কিন্তু সমস্যা হলো মৎস্য ও প্রাণিখাতে অনেক প্রজাতি বিলুপ্তির পথে। তাই বিলুপ্তি হওয়া ঠেকাতে নবীন কর্মকর্তাদের এগিয়ে আসতে হবে। বুধবার (১৫ জানুয়ারি) বিকালে সাভারে অবস্থিত বিসিএস লাইভস্টক একাডেমিতে নবনিয়োগপ্রাপ্ত ৪৩তম বিসিএস (পশুসম্পদ) ও বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের অবহিতকরণ কোর্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, খাদ্যের ক্ষেত্রে শুধু পুষ্টি হলেই চলবেনা তা নিরাপদ কিনা গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। এক্ষেত্রে ফিডের নিরাপত্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ ফিড নিরাপদ হলে মাছ-মাংস নিরাপদ হবে। নবীন কর্মকর্তাদের সরকারি আইনের প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় সম্পর্কে জানতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। তাছাড়া কৃষি মন্ত্রণালয় কীটনাশক ও হার্বিসাইড ব্যবহারের ফলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদে অনেক ক্ষতি করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দা নওয়ারা জাহান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুর রউফ, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। এতে স্বাগত বক্তৃতা করেন বিসিএস লাইভস্টক একাডেমির পরিচালক ডা. এ. কে. এম. হুমায়ুন কবীর। উল্লেখ্য, নবনিয়োগপ্রাপ্ত ৪৩তম বিসিএস (পশুসম্পদ) ও বিসিএস (মৎস্য) ক্যাডার কর্মকর্তাগণের অবহিতকরণ কোর্সে বিসিএস পশুসম্পদ ক্যাডারের ৯৫ জন এবং বিসিএস মৎস্য ক্যাডারের ৩৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

লাইভ জিন ব্যাংক খাবারের পাতে ফিরিয়ে আনছে দেশি মাছের স্বাদ

আমাদের খাদ্য তালিকায় পুঁটি, মলা, শিং, মাগুর, কই, টেংরা, পাবদা, গুলশাসহ নানা প্রজাতির দেশীয় মাছ প্রাণিজ পুষ্টির প্রধান উৎস। বর্তমানে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৪ লাখ নারীসহ ১ কোটি ৯৫ লাখ বা ১২ শতাংশ মানুষ মৎস্য খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্রসহ অসংখ্য নদ-নদী, হাওর-বাঁওড়, খাল-বিল, পুকুর-দিঘিসহ বিস্তীর্ণ সাগর ও বৈচিত্র্যময় জলাশয় নিয়ে বাংলাদেশ। জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জাতীয় অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে জলজ সম্পদের সর্বোত্তম ও কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ অত্যাবশ্যক। আবহমানকাল থেকে মৎস্য ও মৎস্যসম্পদ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সহজলভ্য ও নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ সুস্থ, উদ্যমী ও মেধাবী নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে মৎস্য খাত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মৎস্য খাতের অর্জিত সাফল্যের ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ মৎস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলেও জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে অতিআহরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব, যত্রতত্র নগরায়ণ ও শিল্পায়ন এবং মানবসৃষ্ট নানা কারণে মাছের প্রজনন ও বিচরণক্ষেত্রসহ জলাশয়ের পরিমাণ প্রতিনিয়ত ছোট হয়ে আসছে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যের উৎপাদন ও জীববৈচিত্র্য ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও বৃষ্টিপাতের পরিমাণসহ নানা ধরনের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে ও তার বিরূপ প্রভাব পড়ছে মৎস্য প্রজনন ও উৎপাদনে, বিশেষ করে দেশীয় প্রজাতির মৎস্যের ক্ষেত্রে। আমাদের খাদ্য তালিকায় পুঁটি, মলা, শিং, মাগুর, কই, টেংরা, পাবদা, গুলশাসহ নানা প্রজাতির দেশীয় মাছ প্রাণিজ পুষ্টির প্রধান উৎস। বর্তমানে দেশের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় ১৪ লাখ নারীসহ ১ কোটি ৯৫ লাখ বা ১২ শতাংশ মানুষ মৎস্য খাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) ২০২৪-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২ দশমিক ৫৩ শতাংশ, কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২২ দশমিক ২৬ শতাংশ ও জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ২ দশমিক ৮১ শতাংশ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পৃথিবীর ৫২টির অধিক দেশে রফতানি করছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার ২০২৪-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশ ইলিশ আহরণে প্রথম আর মিঠা পানির মাছ আহরণে বাংলাদেশ চীনকে টপকে দ্বিতীয়। কিন্তু অতিআহরণ ও জলজ পরিবেশ বিপর্যয়সহ নানা কারণে আমাদের অনেক প্রজাতির মাছ আজ বিলুপ্তপ্রায়। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটে (বিএফআরআই) দেশে প্রথমবারের মতো দেশীয় মাছের লাইভ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত এ লাইভ জিন ব্যাংকে দেশের বিলুপ্ত প্রায় ভাগনা, দেশি কই, নাপিত কই, গুলশা, খলিশা, লাল খলিশা, মাগুর, বোয়ালি পাবদা, সরপুঁটি, পুঁটি, শিং, মহাশোল, রুই, বুজুরি টেংরা, ভিটা টেংরা, গুলশা, বাটা, রিটা, মলা, পুইয়া গুতুম, পাহাড়ি গুতুম, ঠোঁট পুইয়া, শাল বাইম, টাকি, ফলি, ঢেলা, চেলা, লম্বা চান্দা, রাঙা চান্দা, লাল চান্দা, পিয়ালি, বৈরালি, দারকিনা, ইংলা, কেপ চেলা, রাণী, লোহা চাটা রাণী, কাকিলা, কাজলী, বাচা, বাতাসি, আঙ্গুস, কানপোনা, ঘাউরা, ভেদা, একঠুঁটি কাকিলা, বাসপাতা, জারুয়া, কেলে টেংরাসহ মোট ১১০ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। অন্যদিকে নীলফামারীর সৈয়দপুরে অবস্থিত স্বাদুপানি উপকেন্দ্রে অন্য একটি লাইভ জিন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে যেখানে এরই মধ্যে চান্দা, সরপুঁটি, তিতপুঁটি, জাতপুঁটি, বাটা, বোল, কালবাউশ, রুই, মৃগেল, টাটকিনি, কাতলা আঙ্গুস, কুর্শা, বৈরালী, খোকশা, বউ মাছ, জারুয়া, পাহাড়ি গুতুম, লোহাচাটা, চেং, কাউয়াসহ ৬২টি প্রজাতি সংরক্ষণ করা হয়েছে। স্বাদু পানির আরও একটি উপকেন্দ্র বগুড়ার সান্তাহারে স্থাপিত হয়েছে যেখানে এরই মধ্যে পিয়ালি, বাতাসি, গাংটেংরা, ভেদা, খশল্লা, চ্যালা, বাচা, আইড়, বেলে কাকিলাসহ ২৪টি প্রজাতি সংরক্ষণ করা হয়েছে। এছাড়া উপকূলীয় লবণাক্ত এলাকার মাছের প্রজাতি সংরক্ষণের জন্য লোনা পানি কেন্দ্র খুলনার পাইকগাছায় আরও একটি লাইভ জিন ব্যাংক স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে সেখানে ভাঙন, পারশে, খরশোলা, চিত্রা, দাতিনা, রয়না, কাইন মাগুর, বেলেসহ ২০ প্রজাতির মাছ সংরক্ষিত আছে। মাছের জার্মপ্লাজম সংরক্ষণের জন্য লাইভ জিন ব্যাংক একটি আধুনিক ধারণা। জিন ব্যাংক হারিয়ে যাওয়া বা বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এর মাধ্যমে মাছের প্রজাতির জিনগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা সম্ভব হয়, যা পরবর্তী সময়ে গবেষণা, প্রজনন ও পুনরায় প্রাকৃতিক পরিবেশে অবমুক্তির জন্য কাজে লাগে। লাইভ জিন ব্যাংক মূলত মাছের জিন সংরক্ষণ করে রাখে, যা তাদের বংশগত বৈশিষ্ট্যগুলোকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এটি বিশেষ করে বিপন্ন বা হুমকির সম্মুখীন দেশীয় মাছের প্রজাতির টিকে থাকার সম্ভাবনা বাড়ায়। জিন ব্যাংক মূলত কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদের জেনেটিক উপাদানের সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা। কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ যখন হুমকির সম্মুখীন হয় তখন জিন ব্যাংকের প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিক উৎসে কোনো দেশীয় মাছ হারিয়ে গেলে সেসব মাছকে পুনরুদ্ধারের জন্য লাইভ জিন ব্যাংক থেকে ব্যবহার করা যাবে। সেক্ষেত্রে লাইভ জিন ব্যাংক থেকে সংশ্লিষ্ট মাছকে হ্যাচারিতে কৃত্রিম উপায়ে পোনা উৎপাদনের মাধ্যমে প্রকৃতিতে ফিরিয়ে আনা হবে। মাত্রাতিরিক্ত মাছ আহরণ, পরিবেশগত বিপর্যয়, জলাশয় সংকোচনসহ নানা কারণে মৎস্যসম্পদ হুমকির সম্মুখীন হলে জিন ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। এছাড়া দেশীয় মাছের বংশগত অবক্ষয় হলে লাইভ জিন ব্যাংকে সংরক্ষিত বিশুদ্ধ জাতের মাছ থেকে পোনা উৎপাদন সম্ভব হবে। দেশকে মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখতে এবং সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন মাছের উৎপাদন বাড়াতে জিন ব্যাংক

অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আশা করা যাচ্ছে। জিন ব্যাংক মূলত দুই ধরনের হতে পারে। এর একটি এক্স সিটু সংরক্ষণ যেখানে জীবন্ত প্রাণীদের বাইরে জেনেটিক উপাদান সংরক্ষণ করা হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়; বীজ, ডিএনএ বা শুক্রাণু ও ডিম্বাণু আর অন্যটি ইন সিটু সংরক্ষণ, যেখানে প্রাকৃতিক পরিবেশেই জীব বা তাদের জিন সংরক্ষণ করা হয়। লাইভ জিন ব্যাংকের মাধ্যমে মাছের বিভিন্ন প্রজাতির জিন সংগ্রহ করা হয় এবং প্রয়োজনীয় সময়ে তা পুনরায় প্রাকৃতিক পরিবেশে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এতে করে দেশীয় মাছের প্রজাতিগুলো বিলুপ্ত হওয়ার ঝুঁকি কমে যায় এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষিত থাকে। বাংলাদেশে যেক্ষেত্রে মাছ অর্থনৈতিক ও পুষ্টির দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেক্ষেত্রে এ ধরনের উদ্যোগের মাধ্যমে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষমতা বাড়ানো যায় এবং মৎস্যসম্পদ দীর্ঘমেয়াদে টিকিয়ে রাখা সম্ভব। দেশের জলাশয়ের ৪৭৫ প্রজাতির সামুদ্রিক মাছ ও ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ রয়েছে। এর মধ্যে ১৪৩ প্রজাতির ছোট মাছ রয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (আইইউসিএন) ২০১৫-এর তথ্যমতে, দেশে স্বাদু পানির ৬৪ প্রজাতির মাছ বিলুপ্তপ্রায়। দেশীয় মিঠাপানির ২৬০ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ ও এর উৎপাদন বাড়িয়ে বাণিজ্যিকভাবে দেশের চাহিদাপূরণ করে বিদেশে রফতানি করাই এ উদ্যোগের লক্ষ্য। দেশের বিভিন্ন আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা এসব মাছ সংরক্ষণ করে উৎপাদন বাড়ানোর প্রক্রিয়া চলমান। মাছের চাষাবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে হ্যাচারিতে দেশি মাছের পোনা ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। বিলুপ্তপ্রায় দেশি মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর হাওর-বাঁওড়, বিল ও নদ-নদীতে অধিকসংখ্যক অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্তপ্রায় মাছের পোনা অবমুক্ত করছে। দেশি প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে লাইভ জিন ব্যাংক অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখেছে। ফলে দেশে বিলুপ্তপ্রায় মাছের প্রাপ্যতা সাম্প্রতিককালে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এসব মাছের মূল্য সাধারণ ভোক্তার সক্ষমতার মধ্যে এসেছে। এর ফলে খাবারের পাতে বৃদ্ধি পেয়েছে দেশি মাছের স্বাদ। দেশি প্রজাতির মাছ সহজলভ্য পুষ্টির অন্যতম উৎস হিসেবে প্রাচীনকাল থেকে বিবেচিত হয়ে আসছে। এর মধ্যে পুঁটি, ঢেলা, মলা, বাইম, শিং, টেংরা, খলশে, পাবদা, চান্দা, মাগুর, কেঁচকি অন্যতম। এসব মাছে ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লোহা ও আয়োডিনের মতো প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ রয়েছে। এসব উপাদান শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে শক্তিশালী এবং রক্তশূন্যতা, গলগণ্ড, অন্ধত্ব প্রভৃতি রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলাশয় সংকোচন, অতি আহরণ ইত্যাদি কারণে মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ায় প্রাকৃতিক জলাশয়ে ছোট মাছের প্রাপ্যতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। দেশের মৎস্য উৎপাদনে দেশি ছোট মাছের অবদান প্রায় ৩৫ শতাংশ। মৎস্য অধিদপ্তর (২০২২)-এর তথ্যমতে ২০২১-'২২ অর্থবছরে পুকুরে চাষের মাধ্যমে দেশি ছোট মাছের মোট উৎপাদন ২ দশমিক ৫৮ লাখ টন। ইয়ারবুক অব ফিশারিজ স্ট্যাটিসটিকস অব বাংলাদেশের তথ্যমতে, ২০২২-'২৩ অর্থবছরে পুকুরে চাষের মাধ্যমে দেশি ছোট মাছের উৎপাদন বেড়ে ২ দশমিক ৭৭ লাখ টনে উন্নীত হয়েছে। মাছের চাষাবাদ বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে হ্যাচারিতে দেশি মাছের পোনা ব্যাপকভাবে উৎপাদিত হচ্ছে। এসব প্রযুক্তি মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারিত হওয়ায় বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতির মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। মাছ এখন সাধারণ ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এসেছে। তাছাড়া নদ-নদী, হাওর ও বিলে দেশি মাছের পোনা অবমুক্তকরণ ও মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করে বিলুপ্তপ্রায় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মাছের জীববৈচিত্র্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। বিলুপ্তপ্রায় দেশি মাছের প্রাকৃতিক উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার হাওর-বাঁওড়, বিল ও নদ-নদীতে অধিক সংখ্যক অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও বিলুপ্তপ্রায় মাছের পোনা অবমুক্ত করছে। দেশি প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এ লাইভ জিন ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। মাত্রাতিরিক্ত মাছ আহরণ, পরিবেশগত বিপর্যয়, জলাশয় সংকোচন প্রভৃতি কারণে মৎস্যসম্পদ হুমকির সম্মুখীন হলে মাছের জিন ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দেশকে মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখতে এবং সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণসম্পন্ন মাছের উৎপাদন বাড়াতে জিন ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে প্রত্যাশা মাছ গবেষকদের। বিলুপ্তপ্রায় মাছ সংরক্ষণের জন্য বিএফআরআই গবেষণা করে এরই মধ্যে ৪০ প্রজাতির মাছ পুনরুদ্ধার করেছে। এছাড়া দেশি মাছের প্রজনন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষক, চাষি ও উদ্যোক্তা পর্যায়ে যেন সহজেই এ মাছগুলো পাওয়া যায় সেজন্যই এ প্রচেষ্টা। গবেষণার ফলে বিলুপ্তপ্রায় দেশি ছোট মাছের উৎপাদন বেড়েছে। বাজারে দেশি মাছের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে এসব মাছ পাওয়া যাচ্ছে। পর্যায়ক্রমে সব বিলুপ্ত প্রজাতির মাছকে খাবার টেবিলে ফিরিয়ে আনাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

লেখক: মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

শখের ছাগলে স্বাবলম্বী মোকলেছার, কিনছেন গাভী ও জমি

ছোটবেলা থেকেই ছাগলের প্রতি অন্যরকম ভালোবাসা মোকলেছার রহমানের। সেই ভালোবাসা থেকেই শখ করে একটি ছাগল কিনে পালন শুরু করেন। একটি, দুটি করে এখন তাঁর খামারে ৫০টি ছাগল। শৈশবের শখ বর্তমানে পরিণত হয়েছে পেশায়। বাড়িতে গড়ে তুলেছেন ছাগলের খামার। ছাগল বিক্রি করে তাঁর মাসে আয় হচ্ছে গড়ে ২৫ হাজার টাকা। মোকলেছার রহমানের বাড়ি রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার সয়ার ইউনিয়নের ডারারপাড় গ্রামে। কাঁচাপাকা সড়ক ধরে মোকলেছারের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, সন্তানের মতো ছাগল পরিচর্যায় ব্যস্ত তিনি। উঠানে কাঁঠালপাতা, খড় ও ভুসি খাওয়াচ্ছিলেন। এই প্রতিবেদককে দেখে উঠে এসে বসতে দিয়ে শোনান ছাগল পালনে সফলতার গল্প। মোকলেছার রহমান জানান, দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি বড়। ছোট ভাই বাবু মিয়া লেখাপড়া শেষ করে চাকরি করেন। বাবা রফিকুল ইসলামও তারাগঞ্জে দাখিল মাদ্রাসায় চাকরি করেন। ২০০৬ সালে মোকলেছার দাখিল পাস করেন। ২০১৪ সালে নীলফামারীর কিশোরগঞ্জের বড়ভিটা গ্রামের মোকছেদুল ইসলামের মেয়ে মোতাহারা আক্তারকে বিয়ে করেন। এরপর চাকরির পেছনে ছোটেন। চাকরি না পেয়ে হতাশ হন। মোকলেছার জানান, হতাশার মধ্যে তাঁকে ভরসা এনে দেয় লেখাপড়ার সময়ে সঞ্চয়ের টাকা দিয়ে কেনা শখের ব্ল্যাকবেঙ্গল জাতের ছাগল। ২০১৬ সালে স্ত্রী মোতাহারার পরামর্শে ছাগল পালন শুরু করেন। এক বছরে ছয়টি ছাগল ২৪টি বাচ্চা দেয়। ১২টি বিক্রি করে ৬০ হাজার টাকা আয় আসে। এই আয় মোকলেছারের চোখ খুলে দেয়। এরপর পুরোদমে ছাগল পালনে নেমে পড়েন। এখন তাঁর খামারে ৫০টি ছাগল। বর্গা দেওয়া আছে আরও ২০টি ছাগল। ছাগল পালনের টাকায় গাভী ও জমি কিনেছেন। তাঁকে দেখে গ্রামের অনেকে এখন ছাগল পালন করে বাড়তি আয় করছেন। মোকলেছারের স্বপ্ন গ্রামের প্রতিটি উঠানে ছাগল পালন করা হবে। সচ্ছলতার হাসি থাকবে প্রত্যেক মানুষের মুখে। মোকলেছার জানান, দেশি জাতের ছাগল বছরে দুবার বাচ্চা দেয়। একটি ছাগল সর্বোচ্চ চারটি বাচ্চা দেয়। ছয় মাস বয়সী একটি ছাগল বিক্রি হয় ছয় থেকে সাড়ে ছয় হাজার টাকায়। একটি ছাগল ছয় মাসে খড়, কাঁচা ঘাস ও ভুসি খায় দুই হাজার টাকার। মোকলেছার রহমান বলেন, ‘বাবা-ভাই দুজন চাকরি করেন। আমিও দাখিল পাসের পর চাকরির জন্য এদিক সেদিক হন্য হয়ে ঘুরেছি; কিন্তু চাকরি হয়নি। শখের বসে কেনা ছাগল দিয়ে খামার গড়ার পরিকল্পনা করি। আলহামদুলিল্লাহ্ এখন আমার খামারে ৫০টি ছাগল। বর্গা দিয়েছি আরও ২০টি। ছাগল পালন করে মাসে ২৫ হাজার টাকা আয় হচ্ছে। চাষাবাদ আর ছাগল পালনের টাকায় সুখে সংসার চলছে। আমার ইচ্ছা ২০০ ছাগলের একটি খামার করার।’ মোকলেছার রহমানকে দেখে ওই গ্রামের সাদেক হোসেন ছাগলের খামার গড়ে তুলেছেন। সাদেক বলেন, ‘মোকলেছারের পরামর্শে তাঁর খামার থেকে ছাগল কিনে খামার করেছি। আমার খামারে এখন ২০টি ছাগল আছে। ছাগল পালনে মনে প্রশান্তি আসে। খরচ অনেক কম। ছাগল বিক্রি করে মাসে ১৫ হাজার টাকা আয় হচ্ছে।’ শুধু সাদেকই নন; গ্রামের সাইফুল ইসলাম, এনামুল হক, আশরাফুল ইসলাম ছাগলের খামার করে বেকারত্ব ঘুচিয়েছেন। ছাগল বিক্রির টাকায় কেউ গাভী, আবার কেউ জমি কিনেছেন। ওই গ্রামের গৃহবধূ ময়না খাতুনের ভিটামাটি ছাড়া কিছু ছিল না। এখন টিনের বাড়ি, ৭ শতাংশ নিজের জমি আছে। গাছগাছালিতে ঘেরা বাড়িতে হাঁস-মুরগি ও ছাগল পালন করে মাসে ছয় হাজার টাকা আয় করছেন। ময়না খাতুন বলেন, ‘ভাই মোর স্বামী কিষান খাটে। রান্না, ঘর গোছানোর কাম করি মুই অলস বসি আছনু। মোকলেছার ভাই মোক একটা ছাগল বর্গা দিছে। এ্যালা মোর ৫টা ছাগল। ছাগল পালনের টাকায় সংসার ভালোয় চলোছে।’ অভাবের কারণে সোমেদার ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। গালমন্দ ছিল নিত্যদিনের বিষয়; কিন্তু এসব থেকে মুক্তি দিয়েছে ছাগল পালন। সোমেদা বলেন, ‘অল্প জায়গায়, অল্প টাকায় ছাগল পালন করা যায়। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে তিন বছর আগে মোকলেছারের কাছে ছাগল কিনে তাঁর পরামর্শে ছাগল পালন শুরু করছি। বিক্রি বাদ দিয়ে এখন তাঁর ছয়টি ছাগল আছে।’ সয়ার ইউনিয়নের ইউপি চেয়ারম্যান আল ইবাদত হোসেন পাইলট জানান,

মোকলেছার শিক্ষিত বেকার যুবকদের মডেল। তাঁর পথ অনুসরণ করে অনেকেই ছাগল পালন করে স্বাবলম্বী হচ্ছেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. কে. এম. ইফতেখারুল ইসলাম বলেন, মোকলেছার রহমান একজন আদর্শ খামারি। তিনি শুধু নিজেই নন, এলাকার অন্তত ১০টি পরিবারকে নিজের ছাগল বর্গা দিয়ে ছাগল পালনে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর দেখানো পথে এলাকার অনেকেই হাঁটছেন। তাঁর কর্মকাণ্ড অনুকরণীয়। প্রাণিসম্পদ বিভাগ থেকে তাঁকে সব সময় সহযোগিতা করা হচ্ছে। সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো

কারেন্ট জাল নিয়ন্ত্রণে অভিযান পরিচালনা করে বা কাউকে শাস্তি দিয়ে সমস্যা সমাধান করা যাবে না: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, মুন্সিগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কারেন্ট জাল উৎপাদন হচ্ছে। এগুলো নিয়ন্ত্রণে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা এবং জাল জব্দ করা হচ্ছে। তবে শুধু অভিযান পরিচালনা করে বা কাউকে শাস্তি দিয়ে সমস্যা সমাধান করা যাবে না। এ কারণে সংশ্লিষ্ট অংশীজন, এমনকি জাল ব্যবসায়ী, কারখানা মালিকদেরও ভূমিকা রাখতে হবে। মঙ্গলবার (১৪ জানুয়ারি) দুপুরে মুন্সিগঞ্জ জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সভাকক্ষে জেলা প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী, মৎস্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা, মৎস্য জাল উৎপাদনকারী ও মৎস্যজীবীদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, কারেন্ট জাল দামে সস্তা, হালকা হওয়ায় পরিবহনে সুবিধার কারণে জেলেরা ব্যবহার করছে। এই জালে ছোট-বড় সব ধরনের মাছ ধরা পড়ে। নেট সাইজের কোনো নিয়ন্ত্রণ না থাকায় কারেন্ট জাল ক্ষতিকর। নেট সাইজ নিয়ন্ত্রণে মৎস্য অধিদপ্তরের বিশেষজ্ঞদের সাথে আলাপ করে সাইজ নির্ধারণ করা হবে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের ইলিশ পৃথিবীর সেরা তা নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি। কিন্তু খুব কষ্ট লাগে যখন দেখতে পাই জাটকা ধরা হচ্ছে। আপনারা যারা জালের ব্যবসা বা ফ্যাক্টরি পরিচালনা করছেন আজকে তাদের জন্যই এ সভা। অবৈধ জাল মূলত ক্ষতিকর জাল। আর এ ক্ষতিকর জাল উৎপাদন, বাজারজাতকরণ যেন না করা হয়, সে বিষয়ে আরও সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। মুন্সিগঞ্জের জেলা প্রশাসক ফাতেমা তুল জান্নাতের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার শরফ উদ্দিন আহমদ চৌধুরী। আরও উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সৈয়দা নওয়ারা জাহান, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবদুর রউফ, পুলিশ সুপার মুহম্মদ শামসুল আলম সরকার, মেজর মো. রিফাত রহমান, লেফটেন্যান্ট মো. আসফাক সাইফ, এনএসআই'র উপপরিচালক কাজী কামাল উদ্দিন, ডিজিএফআই'র উপপরিচালক হাবিবুছ ছিয়াম, র‌্যাব-১০'র উপপরিচালক আনোয়ার হোসেন, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মোল্লা এমদাদুল্যাহ, ডিডিএলজি মৌসুমী মাহবুব, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. নজরুল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা এ.টি.এম. তৌফিক মাহমুদ, মুন্সিগঞ্জের বিভিন্ন উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার, খামার ব্যবস্থাপক, মৎস্যজীবী ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা এসময় উপস্থিত ছিলেন। মতবিনিময় সভা শেষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দ্বিতীয় তলায় ‘পৃথিবীর দীর্ঘতম মাসে মুন্সীগঞ্জের শহিদরা’ এবং ‘২৪ বিপ্লবের সৃতিকাগার’ নামের দুটি চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন। এরপরে উপদেষ্টা মুন্সীগঞ্জের বিসিক শিল্পনগরী পরিদর্শন করেন।

নিষিদ্ধ জাল দিয়ে মাছ ধরবো না, দেশের ক্ষতি করবো না

যমুনার চরে ভেড়া পালন করে স্বাবলম্বী নারীরা

মোছাম্মৎ রাবেয়া খাতুন। বয়স চল্লিশের কোঠায়। সড়ক দুর্ঘটনায় অটো রিকশাচালক স্বামী মো. আব্দুর রাজ্জাকের মৃত্যুর পর অন্যের জমিতে কাজ করেই তিন সন্তান নিয়ে সংসারের হাল ধরেছেন। পাশাপাশি ভেড়া পালন শুরু করেন। শুরুতে দুয়েকটি ভেড়া থাকলেও এখন তার ১৫টি ভেড়া রয়েছে। তার সঙ্গে দুই ছেলে সালাম ও সোলেমান ভেড়ার দেখভাল করেন। শুরুতে কষ্ট করলেও এখন তিনজনের আয় দিয়ে সংসার চালিয়ে সঞ্চয় গড়েছেন। এখন রাবেয়া স্বাবলম্বী। শুধু রাবেয়া-ই নয়, গাইবান্ধায় ভাঙন কবলিত যমুনা চরের প্রায় সকল নারী-পুরুষের একই গল্প। দুর্যোগকবলিত যমুনা নদীর বালু চরে দুর্যোগ সহনীয় ভেড়া পালন করে স্বাবলম্বী হচ্ছে চরের নারীরা। উন্নত জাত, দুর্যোগ সহনীয় ও প্রজনন ক্ষমতা বেশি হওয়ায় ভেড়া পালনে ঝুঁকে পড়েছে চরের নারীরা। এতে সংসারের চাহিদা মিটিয়ে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখছে তারা। সদর উপজেলার কামারজানি ইউনিয়নের গুচ্ছ গ্রামের চর সিধাইয়ের তেমনই একজন স্বাবলম্বী নারী সাবিনা বেগম (৩৫)। কৃষক স্বামীসহ অভাবের সংসারে চার সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণ ছিল খুবই কষ্টের। তিনি বলেন, আমাকে বিনামূল্যে একটি ভেড়া দেওয়া হয়। সেখান থেকে ২০ থেকে ২২টি ভেড়া বিক্রি করেছি। এখন ভেড়ার সংখ্যা ১২টি। প্রতি বছর ভেড়া বিক্রি করে তার আয় লাখ টাকার বেশি। একটি ছোট ভেড়ার দাম ৩ হাজার ও বড় ভেড়া ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা। একটা দিয়ে ভেড়া পালন শুরু করেন তিনি। তাকে দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে এলাকার প্রায় ৩০টি পরিবার ভেড়া পালন করে সচ্ছলতা এনেছে। চর সিধাইয়ের গৃহবধূ আছমা আক্তার (৩৭)। তিনিও বছর তিনেক আগে শুরু করেন ভেড়া পালন। একটি ভেড়া দিয়ে শুরু করেন। ১৬ থেকে ১৮টি ভেড়া বিক্রির পর তার এখনো ৮টি ভেড়া আছে। স্বামী ছানোয়ার হোসেন কৃষিকাজ করেন। ভেড়ার বাচ্চা ও বড় ভেড়া বিক্রি করে সংসারে সচ্ছলতা এনেছেন তিনি। জানা গেছে, উপজেলার কড়াইবাড়ী চরের ছকিনা বেগম (৫৫), মল্লিকা বেগম (৬৫), কোহিনুর বেগম (৪০), নার্গিস আক্তার (৩২) ও মর্জিনা বেগম (৬০) ভেড়া পালনে দেখেছেন সাফল্যের মুখ। ভেড়া পালন করেই চলছে তাদের সংসার। আরেক সুবিধাভোগী মল্লিকা বেগম জানান, তার পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ ছিল। ফ্রেন্ডশিপ থেকে ভেড়া পালন ও সবজি চাষের পরামর্শ দেন। সেই থেকে ভেড়া ও সবজি বিক্রি করে সচ্ছলতা ফিরেছে তার। মোল্লার চরের সাবেক চেয়ারম্যান সাইদুজ্জামান জানান, গাইবান্ধার তিস্তা যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর বুকজুড়ে ১৬৫টি চর রয়েছে। গাইবান্ধার, ফুলছড়ি, সাঘাটা, সুন্দরগঞ্জসহ চার উপজেলার এসব চরে অন্তত ৩ লাখ মানুষ বাস করে। বিশেষকরে তিস্তাসহ তিন নদীর দুর্গম চরাঞ্চল কাপাসিয়া, বেলকা, তারাপুর, হরিপুর, গাইবান্ধার মোল্লারচর, কামারজানি, এরেন্ডাবাড়ী, উড়িয়া ও কঞ্চিপাড়া, সাঘাটা উপজেলার হলদিয়া, কামালেরপাড়া, সাঘাটা সদরসহ অন্তত ১৩টি ইউনিয়ন দুর্গম চরাঞ্চল। চরাঞ্চলের বাসিন্দা ও উপকারভোগী শিল্পি বেগম বলেন, এসব এলাকার প্রায় ৩ লাখ মানুষ তাদের জীবন-জীবিকা চাষাবাদ ও গবাদি পশুসম্পদের ওপর নির্ভর করে। তারা সারা বছর কোনো না কোনো দুর্যোগ মোকাবিলা করে বুক উঁচু করে বাস করে। বিয়েসহ অন্যান্য বিপদ কাটে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগি বিক্রি করে। তারপরেও তারা সুখী মানুষ। গবাদিপশু সম্পদ হিসাবে পালন করলেও এই চরগুলোতে কোনো ভেড়া পালনের প্রচলন ছিল না। তিনি বলেন, আমি একটি ভেড়া পেয়েছি, তার অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমি এখন পাঁচটি ভেড়ার মালিক হয়েছি। একেকটি ভেড়ার ওজনেও অনেক বেশি। দুর্যোগে বিক্রি করে সংসারে খরচ বহন করবো। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ফ্রেন্ডশিপ নামের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ময়মনসিংহে অবস্থিত বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণার নতুন সফলতা হিসেবে স্থানীয় নারীদের উন্নতজাতের ভেড়া দিয়েছেন। যেমন উঁচু তেমন লম্বা। দেখতে বেশ সুন্দর। অল্প সময়ে অনেক বড় হওয়ায় তাদের আনন্দের সীমা নাই। সাজেদা বেগম নামে এক উপকারভোগী বলেন, এই প্রজননের সফলতা হিসাবে ভেড়ার উন্নত জাত অন্তত ৩০ কেজি ওজন ও বছরে ৪বার বাচ্চা দেয়। অল্প পুঁজি ও কম শ্রমে লাভজনক হওয়ায় চরাঞ্চলের নারীদের মধ্যে ভেড়া পালন দিন দিন বাড়ছে। এতে অনেকের অভাবের

সংসারে সচ্ছলতা এসেছে। ফ্রেন্ডশিপ কর্মকর্তা দিবাকর বিশ্বাস বলেন, সারা বছর বন্যা, খড়া ও নদী ভাঙনসহ বিভিন্ন দুর্যোগের সাথে যুদ্ধ করে চরবাসীদের বাঁচতে হয়। সে কারণে পশুসম্পদ রক্ষা করা তাদের কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার কাবিলপুর চরজুরে উন্নত জাতের ভেড়ার দেখা মেলে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় এই নতুন জাতের ভেড়া সাড়া ফেলেছে। দেশি প্রজন্মের সাথে উন্নত জাতের ভেড়ার বীজ ক্রস করে নতুন জাতের ভেড়া উৎপাদন করা হয়েছে। দুর্যোগ সহনশীলতা অর্জনে এই ভেড়া পালনে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। ভেড়া পালন করে আর্থিক সচ্ছলতা ফিরেছে চরাঞ্চলের ২ শতাধিক নারীর। মোমেনা বেগম নামে একজন নারী জানান, এই জাতের ভেড়া পালনে খরচ কম, দুর্যোগ সহনীয়, রোগবালাই কম হয় এবং আকারে বড় হয়। কাবিলপুর চরের ২৪০ জন নারী ২৪০টি ভেড়া দিয়ে ভেড়া পালন শুরু করেন। প্রজনন ক্ষমতা বেশি হওয়ায় ইতোমধ্যে তারা একটি ভেড়া হতে ৮ থেকে ১০টি করে ভেড়ার মালিক হয়েছেন। এই পরিবারগুলো এখন ভেড়া পালন করে নতুন আশার স্বপ্ন দেখছেন। সংসারের চাহিদা, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার খরচ জুগিয়েও নিজেরা স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. মো. মাছুদার রহমান সরকার বলেন, এইটা ভেড়ার নতুন জাত। উন্নত মানের ভেড়ার সাথে ক্রস করে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এই ভেড়া উদ্ভাবন করেছেন। চরাঞ্চলের দুর্যোগ এলাকায় এই ভেড়া চাষ করে অনেকেই অল্প সময়ে স্বাবলম্বী হতে পারে।

সূত্র : দৈনিক ইত্তেফাক

আবারও পাতে ফিরবে সুস্বাদু গোটালি

সাদা আঁশ, কালো চোখ, আর লম্বাটে গড়ন। দেখতে অনেকটা মৃগেল মাছের মতো হলেও এটি আসলে দেশীয় প্রজাতির গোটালি মাছ। এর বৈজ্ঞানিক নাম Crossocheilus latius। অনেকের কাছে এটি 'কালাবাটা' নামেও পরিচিত। একসময় সুস্বাদু এই মাছ দেশের বিভিন্ন নদী, পাহাড়ি ঝর্ণা ও মিঠাপানির জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। এছাড়াও তিস্তা, আত্রাই, সোমেশ্বরী, কংস, পিয়াইন, পদ্মা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র নদীতে এ মাছ সহজলভ্য ছিল। তবে জলবায়ু পরিবর্তন, নদী দূষণ, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, খরার মৌসুমে জলাশয় শুকিয়ে যাওয়া, অতিরিক্ত মাছ শিকার এবং নিষিদ্ধ কারেন্ট জালের ব্যবহারের কারণে অন্যান্য দেশীয় ছোট মাছের মতো গোটালি মাছের সংখ্যাও দ্রুত হ্রাস পেয়েছে। ২০১৫ সালে আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (আইইউসিএন) মাছটিকে বিপন্ন প্রজাতির তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করে। তবে এই সুস্বাদু মাছকে বাংলার ভোজন রসিকদের পাতেও ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএফআরআই)-এর গবেষকরা। এই উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রথমবারের মতো তারা গোটালি মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিএফআরআইয়ের পাবলিকেশন কর্মকর্তা এস. এম. শরীফুল ইসলাম।

জানা গেছে, গোটালি মাছ সংরক্ষণের লক্ষ্যে ২০২৩ সালে বিএফআরআইয়ের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুরের বিজ্ঞানীরা তিস্তা নদীর ব্যারেজ সংলগ্ন এলাকা থেকে মাছটি সংগ্রহ করে গবেষণা কার্যক্রম শুরু করেন। দীর্ঘ গবেষণার পর ২০২৪ সালের জুলাই মাসে দেশে প্রথমবারের মতো কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জিত হয়। এই গবেষণার নেতৃত্ব দেন বিএফআরআইয়ের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. আজহার আলী। সহকারী গবেষক হিসেবে ছিলেন ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. সোনিয়া শারমীন, মালিহা হোসেন মৌ এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা শ্রীবাস কুমার সাহা।

গবেষকরা জানিয়েছেন, গোটালি মাছের কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তি উদ্ভাবনের ফলে এই মাছের চাষ সম্প্রসারিত করা সম্ভব হবে, যা দেশের মৎস্য খাতে নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করবে। বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলের মৎস্যচাষিদের জন্য এটি একটি আশার বার্তা। এই উদ্যোগ গোটালি মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করবে এবং বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে মৎস্য খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো

বগুড়ার নারী উদ্যোক্তার গরুর মাংসের আচার এখন বিশ্ববাজারে

গরুর মাংসের আচার তৈরি করে বিশ্বদরবারে হাজির হয়েছেন বগুড়ার নারী উদ্যোক্তা আফসানা নীরা। মহামারি করোনার সময় চাকরি চলে যায় আফসানার স্বামী সিহাবুর রহমানের। তখন দুজনে মিলে সিদ্ধান্ত নেন স্বাধীনভাবে বিকল্প কিছু করার। পুঁজি নেই। আফসানার শখের মোবাইল ফোনটি মাত্র ৫ হাজার টাকায় বিক্রি করে সেই টাকা দিয়েই শুরু করেন মাংসের আচারের ব্যবসা। দুঃসময়ের আগল ভেঙে সেই আফসানাই এখন বগুড়ার সফল উদ্যোক্তা।

শুধু নিজের পরিবারের সচ্ছলতাই নয়, আফসানার প্রতিষ্ঠানে এখন ১২ জন নারীর কর্মসংস্থান হয়েছে। আচারি ফুড নামে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করে ব্যাপক সাড়া পেয়েছেন। আগামীতে আফসানা বড় পরিসরে আচারের কারখানা স্থাপন করতে চান। আফসানার স্বামী সিহাবুর রহমান বলেন, চাকরি হারানোর পর নানা চিন্তায় পড়েছিলাম। নিজের ঘরে ঠিকমতো খাবার জোগাড় করতে পারতাম না। নানা জটিলতার মধ্যে ছিলাম। সে কারণে স্ত্রীর পরামর্শে আচার তৈরির কাজে সহযোগিতা করি। এখন সেই বেকার জীবন কেটে গেছে আমাদের। মাসে ১ লাখ টাকা কর্মীদের বেতন দিয়েও আরও ২ লাখ টাকা মুনাফা করি। বগুড়া শহরের সেউজগাড়ী এলাকায় আফসানা-সিহাবুর দম্পতির বসবাস।

আফসানা বলেন, ২০২০ সালে আমার স্বামী সিহাবুর রহমানের চাকরি যাওয়ার পরে সংসারে পর্যাপ্ত খাবারও ছিল না। জীবনধারণের জন্য অন্যরকম কিছু একটা অবলম্বন খুঁজতে থাকি। তিনি বলেন, তখন ফেসবুকে নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন কাজের সফলতা দেখে রান্নায় উৎসাহিত হই। সিদ্ধান্ত নেই ব্যবসা করার। পুঁজি ছিল না। তখন আমার শখের মোবাইল ফোনটি বিক্রি করে ৫ হাজার টাকা পাই। সেই টাকা দিয়েই গরুর মাংসের আচার তৈরি করে ব্যবসা শুরু করি।

আফসানার আত্মপ্রত্যয় আর স্বামীর সার্বিক সহায়তায় এখন তারা সফল আচার ব্যবসায়ী। বগুড়ার গণ্ডি পেরিয়ে দেশের বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে পড়ে তার আচারের সুনাম। এক সময় দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আচার পা বাড়ায় বিশ্ব দরবারে। এখন সৌদি আরব, মালয়শিয়াসহ অন্যান্য দেশে আচার বিক্রি করছেন আফসানা।

আফসানা এখন গরুর মাংসের আচার, রসুনের আচার, তেঁতুলের আচার, জলপাইয়ের আচার, আমের আচার, বরইয়ের আচার, আলুবোখারার আচার, চালতার আচার, কাঁচামরিচের আচার ও শুকনা মরিচের আচার তৈরি করছেন। বাজার থেকে মাংস কিনে তা থেকে হাড় ও চর্বি বাদ দিয়ে পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে চুলায় মাংস সেদ্ধ করে হরেক রকমের মসলা দিয়ে তৈরি হচ্ছে সুস্বাদু মাংসের আচার। পানির ব্যবহার নেই বললেই চলে। খাঁটি সরিষার তেল ব্যবহার করা হয় আচার তৈরিতে। অদম্য ইচ্ছাশক্তি আর চেষ্টা কয়েক বছরে তার জীবন বদলে দিয়েছে। বগুড়া জেলা ও রাজশাহী বিভাগ থেকে সরকারিভাবে সফল নারী উদ্যোক্তা পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। পেয়েছেন বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রশিক্ষণ। সূত্র : দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন

বদলে যাবে সারাদেশ, দুধে মাংসে বাংলাদেশ

পাঁচ অভয়াশ্রমে মাছ ধরায় দুই মাসের নিষেধাজ্ঞা

জাটকা রক্ষায় দেশে ইলিশের পাঁচটি অভয়াশ্রমে সব ধরনের মাছ আহরণে নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়েছে। শনিবার (পহেলা মার্চ ২০২৫) মধ্যরাত থেকে শুরু দুই মাসের এ নিষেধাজ্ঞা শেষ হবে আগামী ৩০ এপ্রিল ২০২৫।

মৎস্য অধিদপ্তর জানিয়েছে, জাটকাকে (১০ ইঞ্চির কম দৈর্ঘ্য) ইলিশে পরিণত হওয়ার সুযোগ নিশ্চিতে দেশের মোট ৬টি অভয়াশ্রমে প্রতিবছর এই সময় ২ মাস মাছ আহরণ বন্ধ রাখা হয়। এর মধ্যে পাঁচটি অভয়াশ্রমে নিষেধাজ্ঞা থাকে মার্চ ও এপ্রিলে। মেঘনা, পদ্মা ও তেঁতুলিয়া নদীর অভয়াশ্রমের মোট জলসীমা ৩৯২ কিলোমিটার। বাকি আরেকটি পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার সাগর-সংলগ্ন আন্ধারমানিক নদীর ৪০ কিলোমিটার অভয়াশ্রমে এই নিষেধাজ্ঞা চলে পহেলা নভেম্বর থেকে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত। নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়া পাঁচ অভয়াশ্রমের সীমানা হচ্ছে ভোলার চর ইলিশার মদনপুর থেকে চর পিয়াল পর্যন্ত মেঘনা নদীর শাহাবাজপুর চ্যানেলের ৯০ কিলোমিটার; ভোলার ভেদুরিয়া থেকে পটুয়াখালীর চর রুস্তম পর্যন্ত তেঁতুলিয়া নদীর ১০০ কিলোমিটার; চাঁদপুরের ষাটনল থেকে লক্ষ্মীপুরের চর আলেকজান্ডার পর্যন্ত মেঘনা নদীর ১০০ কিলোমিটার; শরীয়তপুরের নড়িয়া থেকে ভেদরগঞ্জ পর্যন্ত পদ্মার ভাটিতে ২০ কিলোমিটার এবং বরিশাল সদর উপজেলার কালাবদর নদীর হবিনগর পয়েন্ট থেকে মেহেন্দীগঞ্জের বামনীরচর, মেহেন্দীগঞ্জের গজারিয়া নদীর হার্ডপয়েন্ট থেকে হিজলা লঞ্চঘাট, হিজলার মৌলভীরহাট পয়েন্ট থেকে মেহেন্দীগঞ্জ-সংলগ্ন মেঘনার দক্ষিণ-পশ্চিম জাঙ্গালিয়া পয়েন্ট পর্যন্ত মোট ৮২ কিলোমিটার নদ-নদী। মৎস্য অধিদপ্তরের বরিশালের উপপরিচালক নৃপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস বলেন, 'এ নিষেধাজ্ঞার মূল উদ্দেশ্য জাটকা নিধন বন্ধ করে বড় ইলিশে পরিণত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। তবে অন্য মাছ ধরার অজুহাতে জেলেরা নদীতে নেমে জাটকা ধরেন। এ জন্য এই সময় সব ধরনের জেলে নৌকা নিষিদ্ধ করা হয়।' সরেজমিন চাঁদপুর সদর উপজেলার আনন্দবাজার, শহরের টিলাবাড়ি, বড় স্টেশন মোলহেড, পুরান বাজার রনাগোয়াল, দোকানঘর, বহরিয়া, হরিণা ও আখনের হাট জেলেপল্লিতে দেখা যায়, অধিকাংশ জেলে মাছ ধরার নৌকা তীরে উঠিয়ে রেখেছেন। অনেকে জাল মেরামতের কাজ শুরু করেছেন। কেউ প্রস্তুতি নিচ্ছেন নৌকা মেরামতের।

এদিকে জাটকা ধরায় নিষেধাজ্ঞা কার্যকরে সরকার জেলেদের মধ্যে সভা, মাইকিং ও লিফলেট বিতরণের মতো বিভিন্ন সচেতনতামূলক কার্যক্রম চালায়। নদীতে নামলে অভিযান চালিয়ে গ্রেপ্তার ও জরিমানা করা হয়। নিবন্ধিত জেলেদের নিষেধাজ্ঞার আগে-পরে মিলিয়ে চার মাস দেওয়া হয় ৩০ কেজি করে চাল। এর পরও প্রতিবছর অনেক জেলে সুযোগ পেলেই জাটকা নিধন করে। এ নিয়ে জেলেদের অভিযোগ, সরকার যে সহায়তা দেয় তা প্রয়োজনের তুলনায় সামান্য।

চাঁদপুর বহরিয়া এলাকার জেলে মফিজ গাজী বলেন, আমরা অন্য কোনো কাজ জানি না। সরকার নিষেধাজ্ঞা দিছে, আমরা তা মানি। তবে দুই মাসের অভিযান মানতে গিয়ে খুব কষ্ট হয়ে যায়। চাল ছাড়াও একটা সংসার চালাতে আরও অনেক কিছুই লাগে। সন্তানদের পড়ালেখা আছে, কিস্তি আছে। তাই চালের পাশাপাশি আর্থিক সহযোগিতার আবেদন করছি সরকারের কাছে।

চাঁদপুর জেলা মৎস্য কর্মকর্তা গোলাম মেহেদী হাসান বলেন, জেলেদের জন্য খাদ্য সহায়তার বরাদ্দকৃত চাল এরই মধ্যে চলে এসেছে। এ ছাড়া ঋণ দেওয়া সংস্থাগুলোকে এই সময়ে কিস্তির টাকা আদায় না করতে বলা হয়েছে।

সূত্র : দৈনিক সমকাল

অবৈধ জালের ব্যবহার বন্ধ করি, মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করি

কই মাছের কৃত্রিম প্রজনন করার সহজ কৌশল

কই মাছের কৃত্রিম প্রজননের জন্য এমন একটি কৌশলের কথা উল্লেখ করছি যেখানে কই মাছের প্রজননের জন্য কোনো ওভারহেড ট্যাংক এর প্রয়োজন পড়বে না বা কোন হাউজ বা সিস্টার্নেরও প্রয়োজন পড়বে না। শুধুমাত্র একটি হাপা হলেই এই মাছের প্রজনন করা সম্ভব। চাহিদামত বা ইচ্ছানুযায়ী লক্ষ লক্ষ রেণু এবং পোনা উৎপাদন করা যাবে। যার ফলে একজন মৎস্যচাষী অন্ততপক্ষে পোনা কেনা থেকে অনেক টাকা বাঁচাতে পারবেন।

পুকুর প্রস্তুতকরণ: যে পুকুরে কই মাছকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হবে সেই পুকুরটিকে প্রথমেই ভালোভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। পুকুরের ভেতরের চারপাশের যাবতীয় ঘাস বা ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করতে হবে। তারপর পুকুরের চারপাশ দিয়ে ভালোভাবে জাল দিয়ে বেড়া দিতে হবে যাতে বাইরে থেকে কোন ব্যাঙ বা সাপ পুকুরের ভেতর না ঢুকতে পারে। তারপর যেদিন কই মাছকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার জন্য নির্বাচন করা হবে ঠিক সেদিনই পুকুরে পানি ঢুকাতে হবে। অন্যথায় পুকুরে পানি তোলার পর ২/৩ দিন দেরি হয়ে গেলে ওই পানিতে প্রাণী প্লাংকটন জন্মাবে। যার কারণে কাঙ্খিত পরিমাণে পোনা উৎপাদন সম্ভব হবে না। অর্থাৎ প্রাণী প্লাংকটনে কই মাছের রেণু ছোট হওয়ার কারণে রেণুগুলোকে সহজেই নষ্ট করতে পারে।

হাপা সেটিং ও প্রজনন কৌশল: পানি উচ্চতা ২ ফুট হলে ওই দিনই পুকুরে হাপা সেট করতে হবে। পুকুরে হাপা সেটিং করার পর বিকেলের দিকে অর্থাৎ তিনটা চারটার দিকে হাপা পুকুরে স্থাপন করে কই মাছগুলোকে ইঞ্জেকশনের জন্য বড় পাতিল করে পুকুরের কাছে আনতে হবে। এরপর পুকুরে স্থাপিত হাপায় মাছগুলোকে ইঞ্জেকশন করে হাপায় ভরতে হবে।

ইঞ্জেকশন প্রয়োগ পদ্ধতি: প্রতি কেজি স্ত্রী কই মাছকে ৭/৮ মিলিগ্রাম পিজি দিয়ে ইঞ্জেকশন করতে হবে। প্রথমে ১ মিলি এর একটি ইনসুলিন সিরিঞ্জ নিতে হবে যে সিরিঞ্জে ৫০টি দাগ থাকতে হবে। বাজারে ১০০ দাগ সম্পন্ন পর্যন্ত ইনসুলিন সিরিঞ্জ পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে ৫০ দাগ মাত্রার সিরিঞ্জ ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত কই মাছের ক্ষেত্রে ১ কেজি মাছের জন্য ০.৫ মিলি পানি ব্যবহার করা যায়। সেক্ষেত্রে প্রথমে ১ কেজি মাছের জন্য ৮ মিলিগ্রাম পিজি একটি কাঁচের বাটিতে ভালোভাবে পিষিয়ে তারপর ধীরে ধীরে ওই ১ মিলি পানি মেশাতে হবে। এভাবে ১ কেজি স্ত্রী কই মাছের ইঞ্জেকশনের জন্য দ্রবণ প্রস্তুত হয়ে গেল। আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে, সিরিঞ্জে দাগ থাকবে ৫০টি। তা হলে প্রতিটি দাগের জন্য আমরা ২০ গ্রাম ওজনের মাছকে ইঞ্জেকশন করতে পারবো। যদি কোনো মাছের ওজন ১০০ গ্রাম হয় তাহলে ৫ দাগ ওষুধ মিশ্রিত দ্রবণ ব্যবহার করতে হবে। এই হিসেবে সবগুলো স্ত্রী মাছকে ইঞ্জেকশন করে তারপর পুরুষ মাছকে ইঞ্জেকশন করতে হবে। ইঞ্জেকশন করে তারপর পুরুষ মাছকে ইঞ্জেকশন করতে হবে। পুরুষ মাছের ক্ষেত্রে ১ কেজি মাছের জন্য মাত্র ৫ মিলি পিজি মিশিয়ে উপরোল্লিখিতভাবে প্রয়োগ করে সবগুলো স্ত্রী এবং পুরুষ মাছকে একসাথে হাপায় রাখতে হবে। এই পদ্ধতিতে রেণু উৎপাদনের জন্য থাই জাল (পলিথিন জাতীয়) দিয়ে একটি হাপা তৈরি করতে হবে। হাপার মাপ হবে দৈর্ঘ্যে দেড় মিটার প্রস্থে ছয় মিটার। হাপাটি সব দিক থেকেই একই নেট দিয়ে আবদ্ধ থাকতে হবে। আর তা না হলে প্রজননের সময় মাছ বেরিয়ে যেতে পারে। প্রথমে এই হাপাটি তৈরি করার পর পুকুরে ১.৫/২ ফুট পানিতে করতে হবে। যাতে হাপাতে কমপক্ষে ১ ফুট পানি থাকে। হাপার উপরের অংশের এক কোনায় সামান্য খোলা রেখে মাছগুলোকে পিজি হরমোন দিয়ে ইঞ্জেকশন করার পর হাপার এক কোনার খোলা অংশ দিয়ে হাপাতে মাছগুলোকে ছেড়ে দিতে হবে। সাধারণত বিকেল ৩টা থেকে ৪টার মধ্যে মাছগুলোকে ইঞ্জেকশন দিয়ে হাপাতে ছাড়তে হবে। ৭/৮ ঘন্টা পর অর্থাৎ গভীর রাতে মাছগুলো যাতে ডিম পাড়ার সময় হয়। এরপর সন্ধ্যার পর থেকে পুকুরের পাশে যে কোনো শ্যালো দিয়ে ওই হাপার আশপাশ দিয়ে পানির প্রবাহ দিতে হবে। এভাবে ৫/৬ ঘন্টা পানি দিলেই ওই হাপাতে কই মাছ ডিম পারবে। কই মাছের ডিমগুলো ভাসমান বিধায় ওই ডিমগুলো হাপার জালের ফাঁক দিয়ে অনায়াসে পুকুরে চলে যাবে। সকালের দিকে ডিমপাড়া শেষ হলে কই মাছসহ হাপাটিকে পানি থেকে উঠিয়ে ফেলতে হবে। পুকুরে শুধুমাত্র ভাসমান অবস্থায় ডিমগুলো

থেকে যাবে। ডিম দেওয়ার ২০ ঘন্টার মধ্যে ডিম থেকে বাচ্চা বের হবে। বাচ্চা বের হওয়ার ৭২ ঘন্টা পর থেকে ডিম সিদ্ধ করে নাইলন কাপড় দিয়ে ছেঁকে রেণু পোনাকে খাবার দিতে হবে দিনে অন্তত ৩ বার। এভাবে ১ সপ্তাহ ডিমের কুসুম খাওয়ানোর পর নার্সারি ফিড দিতে হবে আরও ১৫ দিন। রেণু ফোটা থেকে ২২ দিনের মধ্যে পোনা তৈরি হয়ে যাবে। এভাবে পুকুরে হাপাতে কই মাছের ব্রুড মাছকে ইঞ্জেকশন দিয়ে অনায়াসে ইচ্ছানুযায়ী রেণু এবং পোনা উৎপাদন করা সম্ভব। সূত্র : এগ্রি নিউজ ২৪ ডট কম

নতুন জাতের বাউ মুরগি পালনে স্বপ্ন বুনছেন খামারিরা

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা একটি নতুন জাতের মুরগি উদ্ভাবন করেছেন, যা দেখতে দেশি মুরগির মতো হলেও শারীরিক বৃদ্ধি ব্রয়লার বা বিদেশি জাতের মুরগির মতো। এই মুরগিটি বর্তমানে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে এবং অনেক খামারি এর মাধ্যমে সফলতা অর্জন করেছেন। মাত্র ৪০-৪২ দিনে এই মুরগির ওজন ১ কেজি ছাড়িয়ে যায়।

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়া উপজেলার আঙ্গারু গ্রামে এই মুরগির জনপ্রিয়তা বাড়ছে, যেখানে স্থানীয়রা একে 'বাউ মুরগি' নামে চেনে। এখানে ৩০টিরও বেশি খামারে এই জাতের মুরগি পালন করা হচ্ছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পোলট্রি বিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মো. আশরাফ আলী এবং অধ্যাপক ড. মো. বজলুর রহমান মোল্লা দীর্ঘ গবেষণার পর 'বাউ ব্রো' নামক দুটি নতুন জাত উদ্ভাবন করেন, যা বাউ-ব্রো-হোয়াইট এবং বাউ-ব্রো-কালার নামে পরিচিত।

২০১৪ সালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) এসপিজিএর প্রকল্পের আওতায় এই জাত দুটি উদ্ভাবনে সফলতা অর্জিত হয়। বর্তমানে এই মুরগিগুলো টেকসই প্রযুক্তি হিসেবে দেশের বিভিন্ন স্থানে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং প্রচলিত ব্রয়লার মুরগির মতো ঘরে পালন করা যায়।

আঙ্গারু গ্রামের খামারি শাহিদা খাতুন জানান, পল্লীকর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) সহযোগিতায় তিনি প্রথম পর্যায়ে ১৫০টি বাউ মুরগি নিয়েছিলেন। মাত্র ৪৫ দিনে তাদের গড় ওজন ১ কেজি ৩০০ গ্রাম হয়েছে এবং তিনি লাভবান হয়েছেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি আরও ৫০০টি বাচ্চা নিয়ে পালন করবেন।

অন্য খামারি আম্বিয়া খাতুন জানান, বাউ মুরগি পালনে কোনো সমস্যা নেই এবং রোগ-বালাইও নেই বললেই চলে। এই জাতের মুরগি দ্রুত বাজারজাত করা যায় এবং ওজনও ভালো আসে।

মানবমুক্তি সংস্থার প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা মো. মারুফ হাসান বলেন, বাকৃবির উদ্ভাবিত বাউ মুরগি উন্নত জাতের একটি মুরগি। খামারের বায়োসিকিউরিটি নিশ্চিত করে নিয়মিত টিকা প্রদানসহ লাভবান হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

উল্লাপাড়া উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ডা. স্বপন চন্দ্র দেবনাথ জানান, বাউ মুরগির কারণে অনেক খামারি লাভবান হয়েছেন। ব্রয়লার মুরগির তুলনায় এটি বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এবং এর স্বাদও দেশি মুরগির মতো।

অধ্যাপক ড. মো. বজলুর রহমান মোল্যা বলেন, বাউ মুরগি এখন সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। এটি সুস্বাদু, মৃত্যুহার কম এবং উৎপাদন বেশি হওয়ায় এর চাহিদা বেড়েছে। শুরুর দিকে বিনামূল্যে বাচ্চা সরবরাহ করা হয়েছিল এবং বর্তমানে কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে, যার ফলে এটি দ্রুত সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। সূত্র : এগ্রি নিউজ ২৪ ডট কম

নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের প্রতিশ্রুতি, সুস্থ্য সবল মেধাবী জাতি

মাছের উচ্ছিস্ট থেকে হাজার কোটি টাকা আয়ের হাতছানি

কম দামে আমিষের চাহিদাপূরণে অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে মাছ। দেশের প্রায় সব জায়গায় কম বেশি মাছের প্রাপ্যতা রয়েছে। মাছ কাটার সময় বেশ কিছুটা অংশ আমরা অপ্রয়োজনীয় বর্জ্য হিসেবে ফেলে দেই। কিন্তু সময়ের প্রয়োজনে এসব ফেলে দেওয়া বর্জ্যও হতে পারে অমূল্য ও অর্থ আয়ের উপকরণ। মাছের উচ্ছিস্ট (Fish Waste) আজ ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি মূল্যের একটি শিল্পে পরিণত হয়েছে। মাছের মাথা, চামড়া, পাখনা, নাড়িভুঁড়ি ও আঁশ থেকে উৎপাদিত ফিশ মিল, ফিশ অয়েল, কোলাজেন, চিটোসান ও অন্যান্য মূল্যবান পণ্য বিশ্বজুড়ে ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি করেছে। বিশেষকরে বাংলাদেশ, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, পেরু, চীন ও থাইল্যান্ড মাছের উচ্ছিস্টকে কাজে লাগিয়ে বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করছে। চীন, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো এসব পণ্যের প্রধান আমদানিকারক। এবার আসুন জেনে নেই বিশ্বব্যাপী মাছের উচ্ছিস্ট শিল্পের বাজার পরিসংখ্যান (২০২৪-২৫) মোট বাজার মূল্য: ১০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। বছরে উৎপাদিত মাছের উচ্ছিস্ট পরিমাণ: ২০-৩০ মিলিয়ন টন। প্রধান উৎপাদনকারী দেশ: পেরু, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম।

প্রধান আমদানিকারক দেশ: চীন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ইউরোপের দেশসমূহ। মাছের উচ্ছিস্ট থেকে উৎপাদিত পণ্যের বাজার মূল্য ফিশ মিল (Fish Meal): ১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৫.৮%); ফিশ অয়েল (Fish Oil): ১২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৬.৩%); কোলাজেন ও জেলাটিন: ৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৭.২%); চিটোসান (Chitosan): ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৮.১%); অ্যাকোয়াকালচার ফিড: ২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার (বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ৬.৫%)। **মাছের উচ্ছিস্ট থেকে উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি বাজার: ফিশ মিল (Fish Meal) রপ্তানি; ব্যবহার:** মাছ ও পোল্ট্রি খাদ্য প্রধান রপ্তানিকারক দেশ: পেরু, চীন, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া। বাংলাদেশ প্রধান আমদানিকারক দেশ: চীন, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র রপ্তানি মূল্য (প্রতি টন): ১২০০-২০০০ মার্কিন ডলার।

ফিশ অয়েল (Fish Oil) রপ্তানি; ব্যবহার: ওষুধ, স্বাস্থ্য পণ্য প্রধান রপ্তানিকারক দেশ: নরওয়ে, পেরু, চীন; প্রধান আমদানিকারক দেশ: ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান রপ্তানি মূল্য (প্রতি লিটার): ২০-৮০ মার্কিন ডলার।

কোলাজেন ও জেলাটিন রপ্তানি; ব্যবহার: প্রসাধনী, ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প প্রধান রপ্তানিকারক দেশ: ভারত, ব্রাজিল, থাইল্যান্ড; প্রধান আমদানিকারক দেশ: ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান রপ্তানি মূল্য (প্রতি কেজি): ১০-২০০ মার্কিন ডলার।

চিটোসান রপ্তানি; ব্যবহার: কৃষি, ঔষধ ও পানিশোধন শিল্প প্রধান রপ্তানিকারক দেশ: চীন, ভারত, থাইল্যান্ড; প্রধান আমদানিকারক দেশ: যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, জাপান; রপ্তানি মূল্য (প্রতি কেজি): ২০-১০০ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার (২০২৪-২৫); বাংলাদেশে বার্ষিক মাছের উচ্ছিস্ট উৎপাদন: ৬-৮ লাখ টন। বাংলাদেশের বার্ষিক ফিশ মিল উৎপাদন: ১০,০০০-১৫,০০০ টন। প্রধান রপ্তানি বাজার: চীন, থাইল্যান্ড, ভারত; বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি মূল্য (প্রতি টন): ১৩০০-১৭০০ মার্কিন ডলার। ইন্দোনেশিয়ার রপ্তানি বাজার (২০২৪-'২৫)। বার্ষিক ফিশ মিল উৎপাদন: ১.৫-২.০ মিলিয়ন টন; প্রধান বাজার: চীন, ভিয়েতনাম, জাপান ফিশ অয়েলের বার্ষিক উৎপাদন: ৫,০০,০০০ টন। মাছের উচ্ছিস্ট রপ্তানি শুরু করতে যা যা দরকার কাঁচামাল সংগ্রহ ও প্রসেসিং প্ল্যান্ট মাছের বাজার, প্রসেসিং কারখানা ও ট্রলার থেকে মাছের উচ্ছিস্ট সংগ্রহ; উন্নত মানের প্রসেসিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে ফিশ মিল, ফিশ অয়েল ও অন্যান্য পণ্য তৈরি আন্তর্জাতিক মানের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) ISO ২২০০০ (Food Safety Management System) GMP (Good Manufacturing Practice) EU Health Certificate রপ্তানি প্রক্রিয়া ও মার্কেটিং আন্তর্জাতিক বায়ার ও ট্রেডিং কোম্পানির সঙ্গে সংযোগ Alibaba, TradeIndia, ExportHub, Global Sources প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে বায়ার খোঁজা রপ্তানি অনুমোদনের জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগে আবেদন করা।

মাছের উচ্ছিস্ট রপ্তানির চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা: আন্তর্জাতিক মান বজায় রাখা কাঁচামালের প্রাপ্যতা ও মৌসুমী সীমাবদ্ধতা পরিবেশবান্ধব প্রক্রিয়াকরণ নিশ্চিত করা। বিশ্বব্যাপী অ্যাকোয়াকালচার ও পশুখাদ্য শিল্পের চাহিদা বৃদ্ধি নতুন বাজার যেমন: মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় প্রবেশের সুযোগ ই-কমার্স ও অনলাইন ট্রেডিং প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে সরাসরি রপ্তানি মাছের উচ্ছিস্ট এখন বর্জ্য নয়, এটি বিলিয়ন ডলারের একটি রপ্তানি খাত। সঠিক পরিকল্পনা সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রযুক্তি ব্যবহার করলে বাংলাদেশ ও ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলো এই বাজার থেকে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করতে পারে। সূত্র: কৃষি সংবাদ

নারী মৎস্যজীবীদের নিবন্ধন হালনাগাদে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, মৎস্যজীবীদের তালিকায় অনেক অমৎস্যজীবী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এটা অন্যায়। তাই তালিকা এমনভাবে হালনাগাদ করা হবে যেন অন্যায়ভাবে কেউ তালিকায় প্রবেশ করতে না পারে। নারী মৎস্যজীবীদের তালিকায় অগ্রাধিকার দেয়ার কথা উল্লেখ করে উপদেষ্টা বলেন, নারী জেলেরা যেন দৃশ্যমান হয় তাদের যেন তালিকায় নাম থাকে এবং একই পরিবারে পুরুষ জেলে থাকলেও নারীদের অগ্রাধিকার দিতে চাই। কোনো অমৎস্যজীবী তালিকায় প্রবেশ করতে না পারে তা কঠোরভাবে দেখা হবে।

রোববার (২৩ ফেব্রুয়ারি) সকালে মনপুরা উপজেলার ঢালচরে জেলেদের সাথে জেলে নিবন্ধন হালনাগাদ সংক্রান্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এসব কথা বলেন। সরকারি চাকরিজীবীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনাদের জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চল বলে কিছু থাকতে পারে না। মনপুরার জেলেরা ইলিশ মাছ দেশবাসীকে খাওয়াচ্ছে আর সরকারি চাকরিজীবীরা এ অঞ্চলের মানুষদের সেবা দিবেন না তা হতে পারে না। প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, মহিষ অত্যন্ত মূল্যবান প্রোডাক্ট। মহিষের মাংস, গরুর মাংসের ঘাটতি পূরণ করতে পারে। মহিষ, ভেড়া লালন-পালনের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, প্রয়োজনে এ অঞ্চলে ভেটেরিনারি চিকিৎসকদের মাধ্যমে পশু পাখির চিকিৎসা দেয়া হবে।

মৎস্য উপদেষ্টা বলেন, পানি থাকলে মাছ থাকবে। নদী, নালা, খাল, বিল খননের অভাবে শুকিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু খনন করার দায়িত্ব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নয়। আমরা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করব, তারা যেন খনন করে মৎস্যসম্পদকে রক্ষা করে। উপদেষ্টা বলেন, আমরা গবেষণা করে দেখেছি আমাদের ব্যান পিরিয়ডে ভারতীয় জেলেরা বাংলাদেশের ভূখণ্ডে প্রবেশ করে ইলিশ মাছ ধরছে অথচ আমাদের জেলেরা সে সময় বসে থাকে। আর এই নিষেধাজ্ঞা এমনভাবে করা হচ্ছে যেন ভারতীয় জেলেরা কোনোভাবেই আমাদের দেশ থেকে ইলিশ ধরতে না পারে। আর সেজন্যই নিষেধাজ্ঞা সময় ৫৮ দিন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, বেকার সমস্যা দূরীভূত করতে শুধু মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় একা পারবে না সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তরুণরা আমাদের নতুন বাংলাদেশ দিয়েছে; আমরা যেন বাংলাদেশকে রক্ষা করতে পারি তার জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ঢালচরের মানুষের কষ্টের কথা বিবেচনা করে এখানে ঘাট তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে এ অঞ্চলের মানুষ বিশেষকরে মৎস্যজীবীরা অনেক উপকৃত হবেন। তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারণা হলো প্রত্যন্ত এলাকার উন্নয়ন। ঢাকায় বসে উন্নয়নের কথা বললে হবে না, যখন প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের মুখে হাসি ফোটানো যাবে, তখনই হবে টেকসই উন্নয়ন। পরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা এবং নৌপরিবহন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান উপদেষ্টা মনপুরার বিভিন্ন চরাঞ্চলের নিবন্ধিত জেলেদের মাঝে নিবন্ধিত কার্ড বিতরণ করেন।

মাছের অব্যবহৃত অংশ থেকে তৈরি হচ্ছে খাদ্য দ্রব্য

মাছের অব্যবহৃত অংশ থেকে তৈরি হচ্ছে খাদ্য দ্রব্য। কার্প জাতীয় মাছের অব্যবহৃত অংশ দিয়ে 'ফিশ স্যুপ পাউডার' (মাছের বায়ু থলি দিয়ে) ও 'ফিশ স্টক' (মাছের পাখনা, ফুলকা, অপারকুলাম দিয়ে) তৈরি করে এসব খাদ্য দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করেছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) একদল গবেষক। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিশারিজ টেকনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফাতেমা হক শিখার নেতৃত্বে গবেষণা করেন স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী সাদিয়া রহমান মুনমুন ও মৌসুমী মণ্ডল। মাছের ফেলে দেওয়া অংশ থেকে এসব খাদ্য দ্রব্য তৈরি করে মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি উন্নতির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের অর্থায়নে গবেষণাটি ২০২৩ সালের জুলাই মাসে শুরু হয়ে শেষ হয় ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে। এই গবেষণাটির মাধ্যমে মাস্টার্সের একটি থিসিস সম্পন্ন হয়েছে এবং বৈজ্ঞানিক জার্নালে প্রকাশের কাজ চলমান রয়েছে। এসব তথ্য জানান গবেষণা দলের প্রধান অধ্যাপক ড. ফাতেমা হক শিখা।

অধ্যাপক ফাতেমা জানান, বাংলাদেশের বিভিন্ন মাছ প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ও বিভিন্ন বাজারে কার্প জাতীয় মাছ কাটার পরে এদের পাখনা, চোয়াল, বায়ুথলিসহ এসব অংশ সাধারণত মানুষের খাবার হিসেবে বিক্রি হয় না বা ব্যবহৃত হয় না। মাছের ফেলে দেওয়া অংশ দিয়ে তৈরি করা হয় এমন খাদ্য দ্রব্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্যও অপ্রতুল। এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে 'ফিশ স্যুপ পাউডার' (মাছের বায়ুথলি দিয়ে) ও 'ফিশ স্টক' (মাছের পাখনা, ফুলকা, অপারকুলাম দিয়ে) এর মতো 'রেডি টু কুক' খাদ্য দ্রব্য তৈরি করা হয়। পরে ভোক্তার জন্য বাজারে এসব খাদ্য দ্রব্য সহজলভ্য করার উদ্দেশ্যে বাকৃবির স্থানীয় বাজার থেকে কার্প মাছের পাখনা, অপারকুলাম ও বায়ুথলি সংগ্রহ করা হয়। সূত্র : দৈনিক জনকণ্ঠ

মাছের অব্যবহৃত অংশ ফেলবো না
পরিবেশ দূষণ করবো না

বিএলআরআই উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভ্যাকসিন সিড প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়িত 'জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) ভ্যাকসিন সিড হস্তান্তর অনুষ্ঠান ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এর ক্রিস্টাল বল রুমে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) ভ্যাকসিনটি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উৎপাদন ও খামারি পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে হস্তান্তর করা হয়। ভ্যাকসিন সিড হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার। এছাড়াও সম্মানীয় অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ান। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক। পবিত্র গ্রন্থ হতে পাঠের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে বেলা ১১.০০ ঘটিকায় অনুষ্ঠানটি শুরু হয়। শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ বি এম মুস্তানুর রহমান। এরপর ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের পটভূমি, ভ্যাকসিন উদ্ভাবন প্রক্রিয়া, উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনের ব্যবহার বিধি ও গুরুত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএলআরআই এর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ট্রান্সবাউন্ডারি এ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টারের দপ্তর প্রধান ড. মুহাম্মদ আবদুস সামাদ। এসময় উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনের উপরে নির্মিত একটি প্রামাণ্যচিত্রও প্রদর্শন করা হয়।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনের পরে অনুষ্ঠিত হয় বিশেষজ্ঞ আলোচনা। এসময় আলোচনা করেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ এর ভেটেরিনারি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. বাহানুর রহমান এবং বাংলাদেশ সিস্টেমস স্ট্রেন্থেনিং ফর ওয়ান হেলথ এর চিফ অফ পার্টি ও চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর ড. নিতীশ চন্দ্র দেবনাথ। বিশেষজ্ঞদের আলোচনার পরে অনুষ্ঠিত হয় উন্মুক্ত আলোচনা। উন্মুক্ত আলোচনা অংশে বক্তব্য রাখেন বিএলআরআই

এর সাবেক মহাপরিচালকগণ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ এবং বিভিন্ন সংগঠন থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিরা একে একে তাঁদের বক্তব্য প্রদান করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যের আগে বিএলআরআই উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ (LSD) ভ্যাকসিন সিডটি আনুষ্ঠানিকভাবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে হস্তান্তর করা হয়। এসময় ভ্যাকসিন বিষয়ক একটি দ্বিপাক্ষীয় সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর এবং ভ্যাকসিনটির প্রোডাকশন ম্যানুয়ালের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেন, এলএসডি ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের মাধ্যমে সার্ক অঞ্চলের মধ্যে বাংলাদেশের লিডারশিপ প্রমাণ করা সম্ভব হয়েছে। তবে উদ্ভাবন এবং হস্তান্তর করেই খুশি হলে চলবে না। আরও পথ আমাদের বাকি রয়েছে, সেগুলোও সঠিকভাবে অতিক্রম করতে হবে। মাঠে যাওয়ার আগে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতা দেখতে হবে। মাঠ পর্যায়ের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সেই তথ্যের আলোকে প্রয়োজনে ভ্যাকসিনের মানোন্নয়ন করতে হবে। এসময় তিনি আরও বলেন, ভ্যাকসিনের মান ঠিক থাকলে বিদেশেও রপ্তানি করা সম্ভব। আমাদের লক্ষ্য দেশের চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যতে বিদেশে এলএসডি ভ্যাকসিন রপ্তানি করা হবে। পাশাপাশি গবেষণার উপরে গুরুত্ব আরোপ করে তিনি আরও বলেন, গবেষণা ও উন্নয়ন (রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট) সক্ষমতা বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। এলএসডি আমাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কতোটা ক্ষতি করছে তা খুঁজে বের করতে হবে। পাশাপাশি রোগাক্রান্ত পশু বিক্রি হচ্ছে কি না তা মনিটরিংয়ের পাশাপাশি রোগাক্রান্ত পশুর মাংস গ্রহণের কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া আছে কি না সেটিও গবেষণা করে দেখতে হবে। নতুন নতুন রোগ আসবেই। সেগুলো মোকাবেলার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। এ বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাসও তিনি ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও বিএলআরআই এর মহাপরিচালক ড. শাকিলা ফারুক তাঁর সমাপনী বক্তব্যে বলেন, এলএসডি একটি ভাইরাসজনিত রোগ হওয়ায় এর প্রতিকারের বিকল্প নেই। সেই ক্ষেত্রে বিএলআরআই উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনটি কার্যকরি ভূমিকা রাখতে পারে। এই ভ্যাকসিন যেনো প্রান্তিক খামারিদের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়, সেই লক্ষ্যে আমাদের সকলকে কাজ করতে হবে। ভ্যাকসিনের মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাবতীয় সকল সহযোগিতা বিএলআরআই হতে করা হবে বলেও তিনি অঙ্গীকার করেন। সূত্র : বিএলআরআই

মহিষের দইকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের আহ্বান

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, মহিষ আমাদের সম্পদ। মহিষ পালনকারীরা আমাদের সম্পদ। মহিষের মাংসে কোলেস্টেরল কম, তাই মহিষের মাংসকে জনপ্রিয় করতে হবে। দেশের নানা স্থানে মহিষের দুধ থেকে তৈরি দইয়ের নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। মহিষের দইকে জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য কাজ করতে হবে। মহিষ পালনকারী খামারিদের সকল প্রকার সহায়োগিতা প্রদানের আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন মাঠ পর্যায় থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, সংগৃহীত তথ্য নিয়ে গবেষণা করতে হবে। উপদেষ্টা রবিবার (১৬ ফেব্রুয়ারি) বিকালে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) অডিটোরিয়ামে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন (প্রথম সংশোধিত)' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা বলেন, ক্লাইমেট চেঞ্জ এখন বাস্তব। তাই ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এমন প্রাণী হিসেবে মহিষকে অনেক গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে। মহিষ বৈষম্যের শিকার হওয়া একটি প্রাণী। তাই মহিষ পালনকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে কাজ করতে হবে। অভিজ্ঞ মহিষ খামারিরা মহিষের হিটে আসা শনাক্ত করতে পারেন, মহিষ সংক্রান্ত নানাবিধ জ্ঞান ধারণ করেন। তাদের জ্ঞানকে বিজ্ঞানের ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। উন্নয়ন প্রকল্প শেষে গবেষণা কার্যক্রমগুলোকে রাজস্ব খাতে স্থানান্তর করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেনো কোন গ্যাপ না থাকে।

উপদেষ্টা আরও বলেন, আমরা যদি খাদ্যে আমিষের যোগানের ক্ষেত্রে এমনকি দুধের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা পর্যাপ্ত সহায়তা পাই না। দেশের গরু, ছাগল, মহিষ, হাঁস, মুরগির যদি উন্নয়ন না করতে পারি তাহলে কিসের উন্নয়ন। আসলে উন্নয়নের ধারণার পরিবর্তন হওয়া উচিৎ। যারা মহিষ পালন করেন তাদের প্রতি যদি কোন সহায়তা না করতে না পারি তাহলে কিসের উন্নয়ন। তিনি বলেন, এ ধরণের গবেষণা হচ্ছে বলেই আমরা মহিষ সম্পর্কে জানতে পারছি। একটি প্রতিষ্ঠানে কাজ করলে তাদের আচরণ কি হবে তা নির্ভর করবে প্রতিষ্ঠানকে তারা কিভাবে দেখে। সেক্ষেত্রে বিএলআরআই এর প্রতি গবেষকদের আবেগ, ভালোবাসা আমাদের মুগ্ধ করেছে। প্রাণিজ আমিষের ক্ষেত্রে বিএলআরআই এর গবেষণার ফলাফল জনগণকে জানানোর আহ্বান জানিয়ে উপদেষ্টা বলেন, এ ধরনের গবেষণার ফলাফল ছোট পরিসরে নয় বরং আরও বড় পরিসরে হওয়া উচিৎ। তিনি বলেন, আমি অতিথি হয়ে নই, বরং সাথে থাকতে চাই। সাথে থাকার সুযোগ হতে বঞ্চিত হতে চাই না। পাশাপাশি তিনি বিএলআরআই এর নানাবিধ সংকট নিরসনে মন্ত্রণালয়ের সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাসও ব্যক্ত করেন।

নিয়মিত দুধ খেলে, মেধা শক্তি বৃদ্ধি পাবে

কানের দুল বিক্রির টাকায় নাজমার খামার, মাসে আয় লাখ টাকা

প্রায় দুই দশক আগে নিজের ব্যবহারের সোনার দুল বিক্রি করে একটি গাভী কিনেছিলেন নাজমা আক্তার (৪০)। সেই গাভীর দুধ বিক্রি করে বাড়তে থাকে তাঁর আয়। নাজমা আক্তারের খামারে এখন রয়েছে ৬০টি গাভী ও বাছুর। খামারটিতে কর্মসংস্থান হয়েছে চার শ্রমিকের। শ্রমিকের মজুরিসহ সব খরচ বাদ দিয়ে খামার থেকে প্রতি মাসে তাঁর আয় হয় লাখ টাকা। নাজমা আক্তার নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নের ৫ নম্বর ওয়ার্ডের একলাশপুর গ্রামের মো. নুরুল আমিনের স্ত্রী। গৃহিণী থেকে সফল খামারি হয়ে ওঠা এই নারীর সঙ্গে সম্প্রতি কথা হয় তাঁর বাড়িতে। স্বামীর পাশে বসে তুলে ধরেন তাঁর পথচলার কাহিনি। প্রসঙ্গক্রমে আসে নানা প্রতিবন্ধকতা পেরোনোর কথাও।

যেভাবে শুরু: ২০০৪ সালের ২৪ ডিসেম্বর বিয়ে হয় নাজমার। স্বামী মো. নুরুল আমিন চট্টগ্রামে কাপড়ের ব্যবসা করতেন। থাকতেন চট্টগ্রাম নগরেই। সংসারের কাজকর্মের মধ্যেই দিনের বড় একটি অংশ অলস কাটতো নাজমার। এরই মধ্যে অবসর সময়ে কিছু একটা করার চিন্তা করেন তিনি। স্বামীর কাছে আবদার করেন একটি গাভী কিনে দেওয়ার। গাভী কেনার জন্য নিজের কানের এক জোড়া সোনার দুলও তুলে দেন স্বামীর হাতে। ওই কানের দুল বিক্রি করা ৫০ হাজার টাকা দিয়ে ফ্রিজিয়ান জাতের একটি গাভী কিনে দেন তাঁর স্বামী। নাজমা আক্তার বলেন, প্রথম কেনা গাভীটি রাখার জন্য বাড়িতে কোনো গোয়ালঘর ছিল না। রান্নাঘরের এক পাশে রাখতে হতো। গরুকে ঘাস-খড় খাওয়ানো, গোসল করানো, গরুর দুধ দোহন-বিক্রিসব নিজেই করতেন। ওই গাভীর দুধ বিক্রি করে যে আয় হতো, সেই টাকা খরচ না করে করা হতো সঞ্চয়। পরে একসময় বাছুরটি বড় হয়ে বাচ্চা দেয়। এভাবে একের পর এক গাভী-বাছুর বাড়তে থাকে। নাজমা বলেন, গরুর সংখ্যা যখন ১০-এ পৌঁছায়, তখন খামারের জন্য বাড়ির পাশের প্রায় ৫০ শতাংশ জায়গায় নতুন ঘর নির্মাণ করেন। স্বামীকে উৎসাহিত করেন ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে খামারের দেখাশোনা করতে। এরপর স্বামী-স্ত্রী মিলে শুরু হয় নতুন পথচলা। ২০ বছরে খামারের পরিধি বেড়ে বর্তমানে গরুর সংখ্যা ৬০টি। খামারের নাম দিয়েছেন নাজমা ডেইরি। স্বামী খামার দেখাশোনা শুরু করার পর খামারের কলেবর আরও বাড়ে বলে জানান নাজমা। তিনি বলেন, বিক্রির জন্য গরু মোটাতাজা করা শুরু করেন তিনি। বাজার থেকে ছোট গরু কিনে এনে খামারে মোটাতাজা করার পর কোরবানির পশুর হাট কিংবা শবে বরাতের আগে বিক্রি করা হয়। এতে বাড়তি আয় হয় তাঁর। নাজমার স্বামী নুরুল আমিন বলেন, তাঁদের খামারে বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে ২০০ লিটার দুধ উৎপাদিত হয়। উৎপাদিত দুধ তিনি পাইকারি দরে বিক্রি করে দেন জেলা শহরের একাধিক নামিদামী রেস্তোরাঁ ও মিষ্টি তৈরির দোকানে। ওই দুধ দিয়ে দোকানিরা নানা ধরনের মিষ্টি ও দই তৈরি করে বিক্রি করেন। ক্রেতাদের কাছে তাঁদের খামারের দুধের বিশেষ কদর রয়েছে। তবে বর্তমানে গোখাদ্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণে আয়ে বেশ টান পড়েছে বলে জানান নুরুল আমিন। তিনি বলেন, আগে যে পরিমাণ আয় ছিল, বর্তমানে সব খরচ বাদ দিয়ে আয় অনেক কমে গেছে। এর পরও খামার নিয়ে আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন রয়েছে তাঁদের।

সন্তানেরাও করেন সহায়তা: নাজমা আক্তার ও নুরুল আমিন দম্পতির সংসারে তিন ছেলে। বড় ছেলে তানিম ভূঁইয়া স্নাতক (সম্মান) তৃতীয় বর্ষে পড়েন। মেজ ছেলে তানজিম ভূঁইয়া এসএসসি পরীক্ষার্থী। ছোট ছেলে তামিম ভূঁইয়া পড়ে অষ্টম শ্রেণিতে। তিন ছেলেই মা-বাবাকে খামারের কাজে সহায়তা করেন। নাজমা আক্তার বলেন, ছেলেরা বাইরে আড্ডা দেওয়ার চেয়ে খামারের কাজ করে বেশি আনন্দ পায়। ছেলেদের সহযোগিতার কারণে খামার পরিচালনা তাঁদের জন্য সহজ হয়ে উঠেছে। জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা আবুল কালাম আজাদ প্রথম আলোকে বলেন, কানের দুল বিক্রি করে নাজমার খামারি হয়ে ওঠার বিষয়টি প্রেরণার। সূত্র : দৈনিক প্রথম আলো

গবাদিপশু পালনে সবুজ ঘাসের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত র‍্যালি

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৪-'২৫ অর্থবছরের অন্তর্ভুক্ত (৩.৬) এর অধীনে গবাদিপশু পালনে সবুজ ঘাসের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৫ ফেরুয়ারি ২০২৫, মঙ্গলবার রাজশাহীর সপুরা ছয়ঘাটি মোড় এলাকার প্রধান ফটক হতে র‍্যালি শুরু হয়ে সপুরা কবরস্থান সংলগ্ন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে পুনরায় সপুরায় এসে শেষ হয়। র‍্যালিটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের উপপরিচালক উম্মে হাবিবা-এর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের খামারি, চাষি, বিভাগীয় প্রাণিসম্পদ দপ্তর এবং বিভাগীয় জেলা মৎস্য দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় কর্মরত সাংবাদিকবৃন্দ এবং বিভিন্ন মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য অংশীজন। র‍্যালি অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয় ও আঞ্চলিক অফিস রাজশাহীর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ। এছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, আঞ্চলিক অফিস রাজশাহী কর্তৃক সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। বেলা ১১.০০ টায় নগরীর সপুরায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর রাজশাহী এর আঞ্চলিক বেতার কৃষি কর্মকর্তা হারুন-অর-রশিদের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের উপপরিচালক উম্মে হাবিবা। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ) ডা. মো. এনামুল কবীর, তথ্য কর্মকর্তা (মৎস্য) মাহবুবা খানম, রাজশাহী জেলা মৎস্য কর্মকর্তা মো. জাহাঙ্গীর আলম। সভায় প্রধান অতিথি বলেন, তথ্য দপ্তরের কাজকে অগ্রগামী করতে অংশীজনের অংশগ্রহণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। খামারিগণ তাদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য জানা বা পরামর্শের জন্য তথ্য দপ্তরে যোগাযোগ করতে পারবেন। এ সময় খামারিগণ তাদের বিভিন্ন মতামত তুলে ধরেন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর আঞ্চলিক অফিস রাজশাহী-এর সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী, অংশীজনবৃন্দ এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক খামারিগণ। সভায় বিভিন্ন উদ্যোক্তা, খামারি ও তথ্য দপ্তরের রাজশাহী আঞ্চলিক অফিসের কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ মোট ২০ জন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর আঞ্চলিক অফিস রাজশাহীর কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠক আতিকুর রহমান আতিক।

মুক্তা চাষে বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের উজ্জ্বল সম্ভাবনা

মুক্তা একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাকৃতিক মুক্তা সংগ্রহ করে আসছে। চীনে সর্বপ্রথম শিল্পভিত্তিক কৃত্রিম উপায়ে মুক্ত চাষ শুরু হয়। পরবর্তীতে জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ভারতসহ বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা উৎপান ও চাষ শুরু হয়। তবে বাংলাদেশি গোলাপি মুক্তা পৃথিবীখ্যাত। এখনো দেশের গোলাপি উজ্জ্বল মুক্তার বিদেশে কদর রয়েছে। অষ্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশ থেকে গোলাপি উজ্জ্বল মুক্তা কিনে নিয়ে যায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত মুক্তাচাষ সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগ সেভাবে গড়ে ওঠেনি। ১৯৭৪-৭৯ সালে মৎস্য অধিদপ্তর মুক্তা বহনকারী ঝিনুক চাষের পরীক্ষামূলক প্রকল্প শুরু করে। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ মৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ও মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের সহযোগিতায় পরীক্ষামূলকভাবে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা চাষের প্রচেষ্টা চালায়। সুষ্ঠ পরিচর্যা, সঠিক প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভব হয়নি। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠান এ ব্যাপারে গবেষণা করছেন। ব্যক্তিগত পর্যায়েও এদেশে অনেকেই বর্তমানে মুক্তা চাষে এগিয়ে আসছে।

মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকসমূহ: তবে সব ঝিনুক থেকেই কিন্তু মুক্তা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশে পাঁচ প্রকার ঝিনুকে মুক্তা পাওয়া যায়। তবে গোলাপি মুক্তা পাওয়া যায় ল্যান্ডস্যালাইডস ও ফার্সিয়া জাতের ঝিনুকে। যা শতকরা ১-৩ ভাগ এবং লামেলীয়া ও মারজেনালিয়া প্রজাতির শতকরা ৭-১০ ভাগ মুক্তা পাওয়া যায়। এছাড়া পাকুনা পাসিন্টা নামক দেশীয় সামুদ্রিক ঝিনুকেও মুক্তা পাওয়া যায়। বাংলাদেশে নদী-নালা, খাল-বিল ও পুকুরে পরিপূর্ণ মুক্তা বহনকারী ঝিনুকের প্রাচুর্যে ভরপুর। এদেশে ঝিনুকে মুক্তা হওয়ার মতো পানি ও মাটির রাসায়নিক গুণ এবং সুন্দর আবহাওয়া বিদ্যমান। মুক্তা বহনকারী ঝিনুক বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই পাওয়া যায়। তবে উন্নতমানের গোলাপি মুক্তা শুধু বৃহত্তর ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল জেলায় পাওয়া যায়।

মুক্তার প্রকারভেদ: মুক্তা বিভিন্ন আকারের, রঙের ও নামের হয়ে থাকে। আকারের দিক দিয়ে লম্বা, ত্রিকোনা, গোলমুক্তা, মেথী, গারা, চুমকী, রাইটকী, ফসকী ডিম্বাকৃতি গোল ও চুর, ঝুর নামে পরিচিত। অপরিপক্ব মুক্তাকে চুর/ঝুর বা গুঁড়া মুক্তা বলা হয়ে থাকে। মুক্তা সাধারণত সাদা, গোলাপি, উজ্জ্বল গোলাপি, কালো সোনালি, সোনালি হলুদ, ধূসর ও মরা মুক্তা (রংহীন) রঙের হয়ে থাকে।

ঝিনুকের খাদ্যভ্যাস: ঝিনুক মিঠা, লোনা উভয় প্রকার জলাশয়ে জন্মায়। পানির তলদেশে বিচরণ ও নিচের স্তরের পঁচাগলা জৈবিক পদার্থ খেয়ে থাকে বলে পঁচাগলা ভোজী প্রাণী হিসেবে পরিচিত। খাদ্য গ্রহণের প্রতিযোগিতায় ঝিনুকের সঙ্গে পকুরের তলদেশের খাদ্যভোজী অন্যান্য মাছ (মৃগেল, চিংড়ি, মিরর কার্প, ব্যাক কার্প প্রভৃতির) চাষ করা যায় না। ঝিনুক বিভিন্ন পরজীবীর পোষক হিসেবে কাজ করে। ঝিনুকের স্পর্শে পুকুরের নিচের স্তরের মাছ বা চিংড়ি রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ঝিনুক সংগ্রহ, মজুদ, পুকুর প্রস্তুত ও ছাড়ার সময়: প্রাকৃতিকভাবে ঝিনুকের চাষে ভালো প্রজাতির লেমিলিডেন্স অরজিনালিস প্রজাতির লম্বাটে ফোলা বা একটু মোটা ধরনের ঝিনুক সবচেয়ে ভালো। জুন-জুলাই মাসে ঝিনুক নদী-নালা, খাল-বিলে ডিম ছাড়ে। ডিমগুলো আঁঠালো বিধায় জলাশয়ে নিমজ্জিত বাঁশ, বাঁশের কঞ্চি বা আগাছার সঙ্গে আটকে থাকে। দুই মাসের মধ্যে খোলসসহ ২-৩ সেন্টিমিটার ছোট ঝিনুকে পরিণত হয়। তখন ঝিনুক সংগ্রহ করে পুকুর বিলে মজুদ করা ভালো। নাইলনের জালের বা বাঁশের গড়া দিয়ে তৈরি বেষ্টনীর মধ্যে ছাড়লে মুক্তা চাষের জন্য অপারেশনের সময় সংগ্রহ করা সহজ হয়। পুকুর/বিলে তখন রাসায়নিক সার, জৈব সার ও চুন প্রয়োগ করতে হবে। এক বিঘা পুকুর মাছের সঙ্গে সর্বোচ্চ ২ হাজার ঝিনুক ছাড়া যেতে পারে। ৩ বছর পর বা ঝিনুকের আকার সাধারণত ১০ সেমি এর উর্ধ্বে হলে জলাশয় থেকে উঠিয়ে মুক্তা সংগ্রহ করতে হবে। মাছ ও ঝিনুক চাষের জন্য পুকুরের গভীরতা ২ মিটার হলে ভালো। মাটি দো-আঁশ বা এঁটেল দো-আঁশ। পুকুর শুকিয়ে বিঘা প্রতি ৬০ কেজি চুন এবং পরবর্তীতে ৫-৬'শ কেজি পঁচা গোবর প্রয়োগ করে পুকুরে তলদেশের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে। বর্ষার পানিতে পুকুর ভরে গেলে ঝিনুক ও মাছ ছাড়তে হবে । মাছ চাষের নিয়মানুযায়ী রাসায়নিক সার বিঘা

প্রতি ১৫ কেজি ইউরিয়া ও ১৫ কেজি টি এস পি প্রয়োগ করা যেতে পারে। পরবর্তীতে প্রতি মাসে ৫ কেজি করে প্রয়োগ করতে হবে।

প্রাকৃতিক মুক্তা উৎপাদনের কারিগরি দিক ও কলাকৌশল: সাধারণত মুক্তা ঝিনুকের শরীরের ছয়টি অংশে পাওয়া যায়। মুক্তার রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে এতে শতকরা ৯২ ভাগ ক্যালসিয়াম, ৬ ভাগ অজৈব খনিজ পদার্থ ও ২ ভাগ পানি। মুক্তার আকার ও রং ইত্যাদি নির্ভর করে ঝিনুকের ভিতর, ক্যালসিয়াম জাতীয় কী ধরনের কণিকা প্রবেশ করেছে তার উপর। প্রাকৃতিকভাবে খাদ্য আহরণকালে বা চলন্ত অবস্থায় ঝিনুকের খোল থেকে কোনো কণা বা বাইরে থেকে যদি কোনো দ্রব্য, (বালির কণা, ময়লা বা কোনো পোকা) ঝিনুকের গায়ে পড়ে তাহলে ঝিনুকের শরীর থেকে এক ধরনের লালা নিঃস্বরণ হয়ে তা ঐ পদার্থের চারপাশ ঢেকে দেয়। প্রতিনিয়ত তার উপর লাল আবরণের পর আবরণ জমা হতে হতে এক সময় মুক্তায় পরিণত হয়। মাটি, পানি ইত্যাদির রাসায়নিক গুণের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রঙের মুক্তা তৈরি হয়ে থাকে।

কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা উৎপাদনের কৌশল: ঝিনুকের বাইরের শক্ত আবরণ বা খোলটি ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা তৈরি। শক্ত আবরণের নিচেই ম্যানটেল নামক পাতলা একটি পর্দা আছে এবং পর্দার উপরের অংশটি ভীষণ সংবেদনশীল। পর্দার এই অংশ (অর্থাৎ পায়ের উর্ধ্বাংশ যেখানে ডিম্বাশয় শুরু) ছিদ্র করে কেটে ক্ষুদ্র কণা/পুতি/ছোট মরা মুক্তা ঢুকানো হয়। ফলে উপরের অংশের বিভিন্ন কোষে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় কোষসমূহ বহিরাগত কণিকা সংস্পর্শ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লালা নিঃসৃত করে এবং বস্তুটিকে ঢেকে দেয়। ফলে ঝিনুকের দেহের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং বেশি পরিমাণে লালা বেরিয়ে কণিকাটিকে শক্ত আকারে রূপান্তরিত করে মুক্তায় পরিণত করে। ফারমিন পারটিসেল ঢুকানোর পর ঝিনুকের মৃত্যুহার শতকরা ২০-২৫ ভাগ এবং কমপক্ষে ১০ ভাগ ঝিনুক শরীর থেকে বহিরাগত কণিকাটিকে বের করে দেয়। জাপান, অস্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত, ফিলিপাইন, বার্মায় বর্তমানে ৭০-৮০ ভাগ ঝিনুক এ পদ্ধতিতে মুক্তা উৎপাদন ও আহরণ করে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা উৎপাদনের জন্য আপারেশন কার্যক্রমকে আরামদায়ক ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, ট্রে, গামলা, বালতি, শুকনা কাপড়, স্পঞ্জ, এন্টিবায়েটিক ওষুধ ইত্যাদি উপকরণের প্রয়োজন।

ঝিনুক অপারেশনের জন্য স্থান নির্বাচন: ঘরের ভেতরে বা বাইরে পুকুর পাড়ে ছায়াযুক্ত স্থান অপারেশনের জন্য উত্তম। অপারেশনের ০৫-১০ দিন আগে সিমেন্টের তৈরি ট্যাঙ্কে ঝিনুক সংগ্রহ করে রাখা ভালো। যাতে সঠিক ব্যবস্থাপনায় অপারেশনকৃত ঝিনুক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতিপালন করা যেতে পারে।

অপারেশন পদ্ধতি: ঝিনুকের দুই স্থানে যথা গোনাড ও দেহস্থিত মোট আবরণীয় মেন্টলের মধ্যে নিউক্লজ প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে। গোনাড থেকে চক্রাকারে ও ম্যানটেল থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ, মুক্তা উৎপাদিত হয়ে থাকে।

মুক্তা ও ঝিনুক আহরণ: ঝিনুকের অভ্যন্তরে মুক্তার বৃদ্ধি দুই থেকে আড়াই বছর দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এরপর বৃদ্ধির হার কমে আসে। ৩০ থেকে ৩৬ মাস পর যখন ঝিনুকগুলো ১০ সেমি বা তদূর্ধ্ব হবে তখন সেগুলো পানি থেকে ওঠাতে হবে। সংগৃহীত ঝিনুকগুলো কেটে খোলসমুক্ত করে মাংস আলাদা করার পূর্বে হাতে আঙুল দিয়ে টিপে দেখতে হবে। কোনো শক্ত পদার্থ অনুভব করলে তা মাংস থেকে বিছিন্ন করে পরিষ্কার পানির পাত্রে রাখতে হবে। এভাবে মুক্তা সংগ্রহ করা যায়। আবার শতকরা ৫ ভাগ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের পানির দ্রবণে ১০ মিনিট আহরিত ঝিনুকগুলো রেখেও মুক্তা আলাদা করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে মুক্তা থাকলে পাত্রের নিচে জমা হবে। ঝিনুকের খোলসও অনেক মুল্যে বিক্রি হয়।

মুক্তার মূল্য: মুক্তার মূল্য আকার, রং ও সাইজের উপর নির্ভর করে। সাদা মুক্তার চেয়ে ঝিকমিক করা গোলাপি প্রভাবিশিষ্ট বড় মুক্তা ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। ছোট মুক্তার এবং অনুজ্জ্বল মুক্তার মূল্য কম। এমনকি টাকা হিসেবেও প্রতিটি কিনতে পাওয়া যায়। পাঁচ (৫) সেমি গভীর এবং ৭.৫ সেমি লম্বা মুক্তাটি এশিয়ার মুক্তা নামে খ্যাত। ১৬২৮ সালে বাহরাইনের নিকটে পারস্য উপসাগরে এক ডুবুরি মুক্তাটি পেয়েছিল। যেটি এখন যুক্তরাজ্যের ভাণ্ডারে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যার মূল্য ছিল ৩০ হাজার পাউন্ড স্টার্লিং। এ ধরনের বড় মুক্তা আজও এক অপার রহস্যময়তার ঘিরে আছে। যা আমাদেরকে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা কাজ করতে প্রলুব্ধ করে। নক্ষত্র দেখে ভবিষ্যৎদান বিদ্যায় মুক্তার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে দেখে থাকেন হস্তরেখাবিদগণ। যেমন ধন সম্পদ প্রাপ্তির জন্য সোনালি মুক্তা, আদর্শের জন্য সাদা মুক্তা, দর্শন গভীরতার জন্য কালো মুক্তা, সৌন্দর্যের জন্য গোলাপি মুক্তা, লাল মুক্তা ব্যবহৃত হয়। স্বাস্থ্য, শক্তি ও চিন্তাশক্তি উন্নয়নের জন্য ধূসর মুক্তা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ। মুক্তার মূল্য অনেক। অলংকার হিসেবে হীরার পরই এর স্থান। শুধু মিঠা পানির ঝিনুকই নয়, সামুদ্রিক ঝিনুক বা ওয়িস্টারে মুক্তা চাষ করে দেশীয় প্রয়োজন মিটানোসহ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। জাপানের মিকিমটো নামে এক বিজ্ঞানী সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা তৈরি করেন। তার নামে জাপানে একটি দ্বীপের নাম মুক্তা দ্বীপ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের কক্সবাজারের মহেশখালী, সোনাদিয়া, সেন্টমার্টিন, কুতুবদিয়া ইত্যাদি এলাকায় প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক বড় সাদা মুক্তা বহনকারী পাকুনা পাসিন্টা নামক ঝিনুক ও মুক্তা চাষের কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। ঝিনুক ও মুক্তার এ অবহেলিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব। মাছের পাশাপাশি মুক্তার চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা গেলে আমাদের দেশেও অন্যান্য দেশের মতো মুক্তা রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে গণ্য হতে পারে। মুক্তা রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পাশাপাশি বেকার যুবকদের কর্মসংস্থান হবে।

সূত্র : জাগো নিউজ ২৪ ডট কম

করলে দেশে মুক্তা চাষ, থাকব সুখে বারো মাস

কাঁকড়ায় বেকারত্ব নিরসন ও বৈদেশিক মুদ্রার সম্ভাবনা

কাঁকড়া আর্থ্রোপোডা শ্রেণির শক্ত খোলসবিশিষ্ট জলজ প্রাণী। প্রজাতি ভিত্তিক মিঠা ও লোনা পানি, উভয় পরিবেশে কাঁকড়া পাওয়া যায়। মিঠা পানিতে চার প্রজাতির এবং লোনা পানিতে এগারো প্রজাতির কাঁকড়া রয়েছে। মিঠা পানির কাঁকড়া আকারে ছোট এবং লোনা পানির কাঁকড়া আকারে বেশ বড় হয়। লোনা পানির কাঁকড়া সমুদ্রে বসবাস করে। মিঠা পানির কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানি হয় না। সামুদ্রিক বড় আকারের কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানি হয়। তাছাড়া সামুদ্রিক এগারো প্রজাতির কাঁকড়ার মধ্যে একমাত্র শিলা কাঁকড়া রপ্তানি হয়। এর বৈজ্ঞানিক নাম সাইলা সিরেটা। অনেক স্থানে এ কাঁকড়া ম্যাডক্রাব নামে পরিচিত। বিদেশে শিলা কাঁকড়ার মাংসই প্রিয় খাদ্য। বাংলাদেশে সর্বত্র সব শ্রেণির লোকের কাছে কাঁকড়া অতি পরিচিত প্রাণী। কাঁকড়া মৎস্যসম্পদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয়ভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী খাদ্য হিসেবে কাঁকড়া গ্রহণ না করলেও বিদেশে রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসহ ইউরোপ মহাদেশেও কাঁকড়ার চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশে বছরে প্রায় ১৪ কোটি টাকার কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানি করে থাকে। বিশ্ব বাজারে কাঁকড়ার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সংগ্রহ প্রক্রিয়াও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি কাঁকড়ার চাষপদ্ধতির কলাকৌশল সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। বাংলাদেশে কাঁকড়া চাষ প্রক্রিয়া এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে। বর্তমান রপ্তানিকৃত কাঁকড়ার প্রায় সবটাই উপকূলীয় চিংড়ি খামার ও সমুদ্রের মোহনা নদী এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল থেকে আহরণ করা হয়ে থাকে।

কাঁকড়া চাষের সুবিধাসমূহ: বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে চাষের পরিবেশ বিদ্যমান। আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা থাকায় এর উৎপাদন লাভজনক। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পোনা (কিশোর) পাওয়া যায়। কাঁকড়ার খাবার স্বল্পমূল্যে গ্রহণ সম্ভব। ওজন হিসেবে কাঁকড়ার বৃদ্ধির হার বেশি। পঁচা আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ রক্ষা করে। কাঁকড়া চাষের উপযুক্ত পরিবেশ বাগদা চিংড়ির ন্যায়। কাঁকড়া উপকূলের লবণাক্ত পানিতে চাষ করা যায়।

কাঁকড়া চাষের পুকুর নির্মাণ: বাগদা চিংড়ি চাষের পুকুরের ন্যায় কাঁকড়ার পুকুরের পানি ধারণের জন্য শক্ত বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। কাঁকড়া হেঁটে বেড়াতে অভ্যস্ত। তাছাড়া মাটিতে গর্ত করে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। তাই বাঁধের অভ্যন্তরে বেড়া স্থাপন করা আবশ্যক। বেড়ার উচ্চতা পানির ওপরে ০.৫ মিটার রাখতে হবে। পুকুরের অভ্যন্তরে এই বেড়া বাঁশের ঘন পাটা, ঘন কঞ্চির বুনন, সিমেন্টের দেওয়াল বা অ্যাসবেস্টাস দ্বারা দেওয়াল তৈরি করা যায়। এই বেড়া কমপক্ষে ০.৫ মিটার মাটির নিচে বসিয়ে দিতে হবে। যেন কাঁকড়া বেড়ার নিচে দিয়ে গর্ত করে পালিয়ে যেতে না পারে। এছাড়া বেড়ার বুনন এমন হতে হবে যেন কিশোর কাঁকড়া ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে। এ ছাড়া অন্য ক্ষতিকর প্রাণীও যেন কাঁকড়ার পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে। পুকুর শুকানো এবং পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বাগদা চিংড়ির ন্যায় গেট বা বাক্স নির্মাণ করে পানি সঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পুকুরের আয়তন ০.২-১.০ হেক্টর হলে ব্যবস্থাপনায় সুবিধা হয়। পুকুরের গভীরতা ১.০-১.৫ মিটার রাখা ভালো। বর্তমানে কাঁকড়া চাষ বলতে কাঁকড়া মোটাতাজা করাকেই বোঝায়। কিশোর কাঁকড়া বাঁশের চাই বা ফাঁদ, পাতা জালে, থলে জাল দিয়ে ধরা হয়। ২০-৪০ গ্রাম ওজনের ৮-১০ হাজার কাঁকড়া প্রতি হেক্টরে মজুত করা যায়। স্ত্রী কাঁকড়ার চাষ বেশি লাভজনক। তাই স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত ৯.১ বা ৯০% স্ত্রী ১০% পুরুষ মজুত। কাঁকড়ার চিমটা পা ও বুকের ফ্ল্যাপ দেখে শনাক্ত করা যায়। পুরুষ কাঁকড়ার চিমটা পা বড়, স্ত্রী কাঁকড়ার চিমটা পা একই বয়সের পুরুষ কাঁকড়ার চেয়ে ছোট। স্ত্রী কাঁকড়ার বুকের ফ্লাপটি অর্ধ গোলাকার, অন্যদিকে পুরুষ কাঁকড়ার ফ্লাপটি অপেক্ষাকৃত সরু ও ইংরেজি ভি আকৃতির। একই বয়সের কাঁকড়া একত্রে সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই ওজন ভিত্তিতে কাছাকাছি ওজনের কাঁকড়া মজুত করা হলে চাষকালীন পরিচর্যার সুবিধা হয়। কিশোর কাঁকড়া একস্থান থেকে অন্যস্থানে বাঁশের ঝুড়িতে পরিবহণ করা যায়। রপ্তানির জন্য গুনাড বিশিষ্ট স্ত্রী কাঁকড়াগুলো শনাক্ত করা হয়। আহরণের পর যে সমস্ত স্ত্রী কাঁকড়া গুনাড/ডিম্বাশয়বিহীন অবস্থায় পাওয়া যায়, সেগুলোকে স্থানীয় ভাষায় খোসা কাঁকড়া বলা হয়। এই খোসা কাঁকড়া বা নরম খোলসা বিশিষ্ট কাঁকড়া নির্ধারিত পুকুরে

১৫-২০ দিন রেখে উপযুক্ত খাবার দেওয়া হয়। এটিকে কাঁকড়া ফেটেনিং বলা হয়। কাঁকড়া ফেটেনিং পদ্ধতি অনেক স্থানেই প্রচলিত আছে।

খাবার সরবরাহ: কাঁকড়া সর্বভূক। এরা সাধারণত জীবন্ত খাদ্য পেতে পছন্দ করে। ছোট ছোট মাছ, সামুদ্রিক ক্রিমি, শামুক, ঝিনুক, কীটপতঙ্গ খেয়ে থাকে। তবে ময়লা ও পঁচা জৈব পদার্থ জাতীয় খাবারও এরা খায়। খাদ্য হিসাবে ছোট গুড়া মাছ, শামুক, ঝিনুকের মাংস, চিংড়ি ও চিংড়ির মাথা, বিভিন্ন প্রকার দেহাবশেষ ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। কাঁকড়ার খোলস তৈরির জন্য ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োজন। তাই মাংসের হাড় বা কাঁটাও কাঁকড়া খেয়ে থাকে। এ ছাড়া চালের কুঁড়া, গমের ভুষি, আটা, ফিশ মিল ইত্যাদি মিশ্রণপূর্বক কাঁকড়ার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাঁকড়ার দেহের বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ট্রেতে খাবার দিয়ে খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ পূর্বক খাবার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। কাঁকড়া বাগদা চিংড়ির ন্যায় নিশাচর প্রাণী। তাই বিকেলে বা সন্ধ্যায় ও রাতে প্রত্যহ ২-৩ বার খাবার দিতে হয়।

কাঁকড়া আহরণ ও বাজারজাতকরণ: মজুতের ৩-৪ মাস পর কাঁকড়া আহরণ করা যায়। বাংলাদেশে সবচেয়ে চাষের উপযুক্ত সময় মার্চ থেকে জুলাই মাস। এ সময় পানির গুণাগুণ ও তাপমাত্রা উপযুক্ত পর্যায়ে থাকে। কাঁকড়া ধরার জন্য বাঁশের চাই অথবা জালের তৈরি ফাঁদ সবচেয়ে উপযুক্ত। ধরার সময় কাঁকড়ার পা ভেঙে গেলে বাজারজাত করা যায় না। লিফ্‌ট নেট বা চাই ফাঁদে খাবার দিয়ে কাঁকড়া পর্যায়ক্রমে ধরা যায়। কাঁকড়া ধরার আগেই পুকুরে খাবার সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে। কাঁকড়া একপাত্র থেকে অন্যপাত্রে নেওয়া বা রাখার জন্য বাঁশের চিমটা এমন ভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন পা ভেঙে না যায়। কাঁকড়াকে পেছন দিয়ে চিমটা বা হাত দিয়ে ধরা যায়। বর্তমানে জীবন্ত কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। তাই কাঁকড়া চিমটা বা পাস্টিকের ফিতা দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে ঝুঁড়িতে ভরে বাজারজাত করা যায়। পরিবহনের সময় ঝুড়িতে স্যাঁতসেঁতে ভাব বজায় রাখার জন্য লবণ পানি ছিটিয়ে দিতে হয়। কাঁকড়ার ঝুড়ি অন্ধকারে/ছায়াযুক্ত ঠান্ডা স্থানে রাখতে হয়। বাংলাদেশ থেকে এখনো সিদ্ধ করা অথবা হিমায়িত কাঁকড়া বিদেশের বাজারে বাজারজাত করা হয় না। যদি ওই অবস্থায় রপ্তানি করা যেত, তবে পরিবহন খরচ অনেক কম হতো। কাঁকড়া চাষের উপযুক্ত পরিবেশ আমাদের দেশের উপকূল অঞ্চলে রয়েছে। যদিও এর চাষ এখনো তেমন প্রসার লাভ করেনি। কাঁকড়ার রপ্তানি বাজারদর হিসাবে এর চাষ বেশ লাভজনক। সঠিকভাবে চাষ করা গেলে বর্তমান হিসাবে প্রতি কেজিতে ৬০ টাকারও বেশি নিট লাভ করা যায়। কাঁকড়াও একটি চাষযোগ্য প্রাণী এবং এর উৎপাদন একটি লাভজনক বিনিয়োগ। বিষয়টি প্রদর্শনের জন্য দেশে কাঁকড়া খামার স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি এ বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সরকারি পর্যায়ে করতে হবে। বর্তমানে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব মোচনেও সহায়ক হবে। জীবন্ত কাঁকড়া রপ্তানির জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন হয়। কাঁকড়া চাষ এবং উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য এ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের ওপর ন্যাস্ত করতে হবে। উপকূলীয় এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের বরোপিট এলাকায় পরিকল্পিত কাঁকড়া চাষ করে জমির সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায়। কাঁকড়ার বাচ্চা সরবরাহ নিশ্চিত করণের জন্য সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ খালসমূহে বেহুন্দি জাল ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাঁকড়া সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে সংশ্লিষ্ট সবার প্রত্যাশা।

লেখক: ড. ফোরকান আলী, গবেষক ও সাবেক অধ্যক্ষ।

ইফতারিতে মাছের শিঙাড়া-সমুচা আনলো বিএফডিসি

রমজান উপলক্ষ্যে মাছ দিয়ে তৈরি শিঙাড়া, সমুচা, রোলসহ ইফতার উপযোগী বিভিন্ন খাবার বিক্রি শুরু করে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন (বিএফডিসি)। সোমবার (৩ মার্চ) বিকেলে কারওয়ান বাজারে অবস্থিত বিএফডিসি ভবনের মৎস্য বিতানে বিক্রি কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন সংস্থাটির চেয়ারম্যান সুরাইয়া আখতার জাহান।

বিএফডিসির তথ্য অনুসারে, রমজান উপলক্ষ্যে মৎস্যজাত ইফতারির পণ্যের প্রদর্শনী ও প্রচলনের জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন ও সারা ফিশ প্রোডাক্টস লিমিটেড যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে মাছের তৈরি ১০ পদের ইফতারি পাওয়া যায়। সেগুলো হলো ফিশ শিঙাড়া, লইট্টা ফ্রাই, ফিশ পুরি, ফিশ চানাচুর, চিংড়ি ফ্রাই, ফিশ সমুচা, মাছের ছোলা বুট, ফিশ রোল, ফিশ হালিম ও ফিশ টিকিয়া। ২৫০ গ্রামের ১০টি ফিশ শিঙাড়া ১৯৫ টাকা, ২৫০ গ্রামের ১০টি চিংড়ি ফ্রাই ১৯৫ টাকা, ২৫০ গ্রামের ১০টি ফিশ রোল ১৯৫ টাকা, ২৫০ গ্রামের ১০টি সমুচা ১৯৫ টাকা, ২৫০ গ্রামের ১০টি লইট্টা ফ্রাই ১৯৫ টাকা। কারওয়ান বাজারে অবস্থিত বিএফডিসি ভবনের মৎস্য বিতানে প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে ইফতারের সময় পর্যন্ত মৎস্যজাত ইফতারির পণ্য বিক্রি হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের চেয়ারম্যান সুরাইয়া আখতার জাহান বলেন, 'সুস্থ ও মেধাবী জাতি গঠনে মাছের প্রোটিনের বিকল্প নেই। মাছের প্রোটিন অত্যন্ত নিরাপদ আমিষ। আমরা চাই, মৎস্যজাত পণ্য আরও জনপ্রিয় হোক। পুরো রমজানে দেখব ক্রেতাদের সাড়া কেমন। ফল ভালো পেলে সারা দেশে বড় পরিসরে উদ্যোগ নেব।'

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনের যুগ্ম পরিচালক মো. মাসুদুল আলম বলেন, 'মানুষের রুচির পরিবর্তনের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে মৎস্যজাত ইফতারি বিক্রির কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। পোলট্রি যেমন জনপ্রিয়, আমরা চাই মৎস্যজাত পণ্যও এমন জনপ্রিয় হোক। মানুষের খাবারের তালিকায় মৎস্য প্রোটিন (আমিষ) থাকুক।'

এর আগে গত বছরের মার্চ মাসে বিএফডিসি রেডি টু কুক ফিশ বিপণন কার্যক্রম হাতে নিয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল, মোট ৪০ প্রজাতির মাছ রেডি টু কুক হিসেবে তিনটি স্থানে স্থায়ীভাবে বিপণন করা হবে। সূত্র: দৈনিক আজকের পত্রিকা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব: গবাদি প্রাণীর জন্য কী অপেক্ষা করছে

জলবায়ু পরিবর্তন আমাদের সময়ের সবচেয়ে বড় বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জগুলোর একটি। 'জলবায়ু পরিবর্তন শুধু পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি মানবতার জন্য একটি অস্তিত্ব সংকট এই সত্যটা কি আমরা উপলব্ধি করছি? পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে এমন একটি স্তরে পৌঁছেছে, যা পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং গবাদি প্রাণীর জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনছে।

জলবায়ু পরিবর্তন গবাদি প্রাণীর জীবনযাত্রার ওপর গভীর প্রভাব ফেলছে, যা খাদ্য নিরাপত্তা এবং কৃষি অর্থনীতির জন্য বড় ধরনের হুমকি সৃষ্টি করছে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং পরিবেশগত পরিবর্তন গবাদিপশুর স্বাস্থ্য, উৎপাদনশীলতা এবং প্রজননক্ষমতায় উল্লেখযোগ্য বিরূপ প্রভাব ফেলে। দুগ্ধজাত গবাদি প্রাণীর ওপর জলবায়ুগত প্রভাবের ফলে যেসব সাধারণ লক্ষণ দেখা দিচ্ছে তা হলো খাদ্য গ্রহণ হ্রাস, দুধ উৎপাদন ও দুধের চর্বি হ্রাস, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার বৃদ্ধি, শরীরের তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং প্রজননক্ষমতা হ্রাস।

তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে প্রাণীদের দেহে হিট স্ট্রেস হয়, যা তাদের কর্মক্ষমতা কমিয়ে দেয়। খাদ্য গ্রহণ কম হওয়ার কারণে প্রাণীরা পর্যাপ্ত শক্তি পায় না, ফলে কাজ করার ক্ষমতা বা উৎপাদনশীলতা হ্রাস পায়। এ ছাড়া গর্ভধারণের হার কমে যায় এবং জন্মানো বাছুরের শরীরের ওজন কম হয়। পর্যাপ্ত পুষ্টি না পেলে প্রাণীদের দুধ বা মাংসের পুষ্টিমান কমে যায়। শারীরিক স্ট্রেসের কারণে প্রাণীরা কম পরিমাণে দুধ উৎপাদন করে বা মাংসের গুণগত মান কমে যায়। অতিরিক্ত তাপের সরাসরি প্রভাবে ৬৫ শতাংশ দুধ উৎপাদন কমে যায়। এছাড়া দুধে প্রোটিনের পরিমাণ কমতে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার পরিবর্তন রোগজীবাণু ও প্যারাসাইটের বিস্তার বাড়ায়। উদ্ভূত পরিবেশে নতুন ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া প্রাণীদের ওপর আক্রমণ করে। রোগ প্রতিরোধক্ষমতা কমে যাওয়ায় প্রাণীরা সহজেই সংক্রমণের শিকার হয়। এমনকি কলোস্ট্রামে ইমিউনোগোবুলিনের ঘনত্বও কমে যায়। জলবায়ু পরিবর্তনের পরোক্ষ প্রভাব প্রাণিসম্পদ এবং কৃষি ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাতে পারে। প্রভাবের ফলে যেসব সাধারণ লক্ষণ দেখা দিচ্ছে তা হলো: (১) **মাটির উর্বরতায় পরিবর্তন:** বৃষ্টিপাতের ধরন পরিবর্তন এবং খরার কারণে মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পায়। পুষ্টি উপাদানের ঘাটতি মাটির উর্বরতাকে প্রভাবিত করে, যা প্রাণিখাদ্যের উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। (২) পরিবেশ ব্যবস্থার রূপান্তর: তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং বায়ুমণ্ডলীয় পরিবর্তনের ফলে চারণভূমি, বনভূমি এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র পরিবর্তিত হয়। পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট হয়ে প্রাণিপালন ব্যবস্থায় চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করে। (৩) সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি: খাদ্য, পানি, এবং চারণভূমির জন্য মানুষের ও প্রাণীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ে। সীমিত সম্পদে জীবিকার জন্য এই প্রতিযোগিতা বিশেষত গ্রামীণ এলাকায় সংকট তৈরি করে। (৪) খাদ্যশস্যের উৎপাদন, গুণগত মান এবং প্রকারে পরিবর্তন: শস্যের বৃদ্ধি ও ফলন জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীল। খরা বা বন্যার কারণে শস্য উৎপাদন হ্রাস পায়। খাদ্যশস্যের গুণগত মান হ্রাস পাওয়ায় পশুর জন্য উপযুক্ত পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব হয়। (৫) চারণভূমির উৎপাদনশীলতায় পরিবর্তন: তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার পরিবর্তনের ফলে চারণভূমি সংকুচিত হয়। ঘাস বা প্রাণিখাদ্য উৎপাদন কমে যাওয়ায় গবাদিপশুর পুষ্টির ঘাটতি হয়। (৬) রোগতত্ত্বের পরিবর্তনের কারণে নতুন রোগের উদ্ভব: পরিবেশগত পরিবর্তনের ফলে রোগবাহী পোকামাকড়ের বিস্তার বৃদ্ধি পায়। নতুন জীবাণু ও রোগের উদ্ভব হয়, যা প্রাণীদের স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে গবাদি প্রাণীর যত্নে যা যা করণীয় তা হলো: (১) তাপ এবং শক্তিশালী সূর্যালোক থেকে প্রাণীদের রক্ষা করা। (২) গবাদি প্রাণীর জন্য ঘন ছায়াযুক্ত গাছ লাগানোর ব্যবস্থা করা। (৩) খোলা এবং বায়ু চলাচল শেড তৈরি করা, যা প্রাণীদের আর্দ্রতা এবং সরাসরি সূর্যালোক থেকে রক্ষা করে। (৪) শেডের ছাদ পরিষ্কার এবং সাদা রঙের ব্যবস্থা করা (৫) গরমের দিনে প্রাণীদের শরীর ঠান্ডা রাখতে তাদের দিনে ১ থেকে ২ বার ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করানো, বিশেষ করে মহিষকে গোসল করানো এবং ধারায় ঝরনার পানি ছিটিয়ে দেওয়া। (৬) প্রাণীর জন্য সর্বদা বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করা ও দিনে বারবার পানি পরিবর্তন করা। (৭) পাখা, কুলার, ফোয়ারা ইত্যাদির মতো শেড কুলিং ডিভাইসের ব্যবস্থা করা। (৮) হালকা, সহজপাচ্য এবং তাজা খাবার সরবরাহ করা। সকালে ও সন্ধ্যায় খাবার দেওয়া, যখন তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকে (গ্রীষ্মকালে ১০টার আগে এবং বিকেল ৪-৫ টার পরে খাবার সরবরাহ করা) (৯) শীত না হলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় সকালে বা সন্ধ্যায় মাঠে চরাতে হবে। (১০) গরমে রোগবালাইয়ে ঝুঁকি বেশি থাকে, তাই নিয়মিত ভ্যাকসিন এবং স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো এবং যদি প্রাণী অসুস্থ হয়ে পড়ে, দ্রুত প্রাণী চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া।

(১১) গোয়ালঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা এবং গরমে দুর্গন্ধ রোধের ব্যবস্থা করা। (১২) গবাদি প্রাণীদের জন্য তাপসহনশীল (শাহিওয়াল, ব্রাহামা, জেবু জাতের গরু তাপ-সহনশীল গবাদিপশুর জাত হিসেবে বিবেচনা করা হয়) জাত নির্বাচন করা। পরিশেষে, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব গবাদি প্রাণীদের জীবনে নতুন নতুন সংকট তৈরি করছে। তবে সচেতনতা, বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি এবং সম্মিলিত উদ্যোগে কাজ করার মনোভাব আমাদের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সাহায্য করবে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কমাতে সরকার, খামারি এবং গবেষকদের সম্মিলিত উদ্যোগ দরকার। আসুন, আমরা সবাই একসঙ্গে কাজ করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই এবং নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তুলি, যা মানুষের পাশাপাশি গবাদি প্রাণীদের জীবনও সুরক্ষিত করবে। সূত্র : এগ্রি নিউজ ২৪ ডট কম

মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রাণিস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উপদেষ্টা ফরিদা আখতার বলেছেন, যারা জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করেন তারা অধিকাংশই নিজেদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা করেন। কিন্তু মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় প্রাণিস্বাস্থ্যও গুরুত্বপূর্ণ তা অধিকাংশ মানুষ ভুলে যায়। ওয়ান হেলথের মধ্যে মানুষ ও প্রাণিস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেয়া হলেও পরিবেশের স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেয়া হয়না। কিন্তু মনে রাখতে হবে পরিবেশের মধ্যে মানুষ আর প্রাণী আছে। উপদেষ্টা বৃহস্পতিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) বিকালে সাভারে অবস্থিত ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরিতে মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করণের আহ্বান জানিয়ে তিনি আরও বলেন, খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলে থাকি কিন্তু খাদ্য নিরাপদ কী না তা আমাদের দেখতে হবে। খাদ্য যদি নিরাপদভাবে উৎপাদিত না হয় তাহলে এ ধরনের খাদ্য দিয়ে আমাদের কোনো লাভ নাই। শুধু বিল্ডিং থাকলে হবে না কাজ করতে হবে মানুষ দিয়ে তাদের আবার দক্ষ হতে হবে। গবেষণা পর্যায়ে যেমন বিজ্ঞানী লাগবে তেমনি মাঠ পর্যায়ে কর্মী লাগবে। উপদেষ্টা বলেন, প্রাইভেট সেক্টর সরকারের সাথে মিলেমিশে কাজ করলে জনগণের নিকট আরও বেশি মাত্রায় পৌঁছানো যাবে। প্রাইভেট সেক্টরকে প্রোফিট প্রাধান্য না দিয়ে সেবাকে প্রাধান্য দেয়ার আহ্বান জানান তিনি। পরে উপদেষ্টা বিসিএস লাইভস্টক একাডেমির বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত শহিদ সাফওয়ান সদ্যের নামে মুল ফটকের নামকরণ উদ্বোধন করেন। এ সময় শহিদ সাফওয়ান সদ্যের বাবা ডা. আখতারুজ্জামান লিটন, মাতা খাদিজা বিন জুবায়েদ শিল্পী, বোন আতকিয়া জামান তিশমা, বিসিএস লাইভস্টক একাডেমির কর্মকর্তাবৃন্দ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। উপদেষ্টা বিসিএস লাইভস্টক একাডেমিতে Professional Skill Development Training Through " Specialized Training Course (STC) For the Livestock Officers এর সমাপনী কোর্সে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হন। এ কোর্সে বিসিএস লাইভস্টক ক্যাডারের ৬০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, বাজারে স্থিতিশীলতা আনতে রমজান মাসে জনসাধারণ যেন সহজেই প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মেটাতে পারেন সেজন্য রাজধানী ঢাকার ২৫টি পয়েন্টসহ সারাদেশে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রির ব্যবস্থা করেছে। তিনি আরও বলেন, পণ্য সরবরাহ করে বাজারে যে কৃত্রিম উচ্চমূল্য রাখা হয় তার চেয়ে কম মূল্যে বিক্রি সম্ভব তা প্রমাণ করতেই এমন উদ্যোগ। উল্লেখ্য, জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারের লক্ষ্যে সরকারি অর্থে আন্তর্জাতিকমানের এই ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য নিরাপদ মাংস, দুধ ও ডিম উৎপাদন নিশ্চিতে সঠিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন, সংক্রমণ প্রতিরোধ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা নিশ্চিত করা। প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিএলআরআই) এর আয়োজনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. আবু সুফিয়ানের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের পরিচালক ডা. মো. বয়জার রহমান, বিএলআরআই এর পরিচালক ড. মো. মোস্তফা কামাল, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ও বিএলআরআই এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তারা এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

লেখক: মো. মামুন হাসান, সিনিয়র তথ্য অফিসার (তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্তা), মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ, জবাই পরবর্তী চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে করণীয়

গরু সংগ্রহ

হৃষ্টপুষ্টকরণের জন্য গরু ক্রয়ের সময় নিম্নোক্ত বিষয়াদি বিবেচনায় রাখতে হবে:

- দৈহিক আকার বর্গরূপ হবে;
- চামড়া ঢিলা, শরীরের হাড়গুলো আনুপাতিকহারে মোটা, মাথা ও ঘাড় চওড়া এবং খাটো হতে হবে;
- পা খাটো এবং সোজা হতে হবে;
- পেছনের অংশ ও পিঠ চওড়া, লোম খাটো ও মসৃণ থাকবে;
- এক থেকে দেড় বছরের ষাঁড় গরু ক্রয় করতে হবে;
- শংকর জাতের গরু অল্প সময়ে বেশী ওজন অর্জন করে।

হৃষ্টপুষ্টকরণ

- গরু সংগ্রহের পর কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং ক্ষুরা, তড়কা, বাদলা, গলাফুলা এবং লাম্পি স্কিন ডিজিজ রোগের টিকা প্রদান করতে হবে;
- উৎপাদন খরচ সাশ্রয়ে ইউরিয়া মোলাসেস দিয়ে প্রক্রিয়াজাত খড় (ইউএমএস) বা সাইলেজ খাওয়ানো যেতে পারে;
- হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রক্রিয়ায় স্টেরয়েড বা হরমোন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা যাবে না।

জবাই পরবর্তী চামড়া ছাড়ানো

- জবাই করার পূর্বে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ ও গোসল করাতে হবে;
- ধারালো ছুরির অগ্রভাগ দিয়ে জবাই করার স্থান থেকে গলা, সিনা, ও পেটের উপর দিয়ে সোজা ভাবে কাটতে হবে;
- সামনের দু-পায়ের হাঁটু থেকে সিনা পর্যন্ত একটি দাগ কেটে প্রথম দাগের সাথে যোগ করতে হবে। অনুরূপভাবে পেছনের দু-পায়ের হাঁটুর নিচ থেকে দাগ কেটে প্রথম দাগের সাথে যোগ করতে হবে;
- উৎপাদিত চামড়া যথাশীঘ্রই বিক্রয় কেন্দ্রে পাঠাতে হবে।

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

- সরকার নির্ধারিত স্থানে পশু জবাই করতে হবে;
- পশু জবাই করার পর রক্ত, মল-মূত্রাদি, নাড়িভুঁড়ির উচ্ছিষ্টাংশ চারিদিকে ছড়িয়ে পরিবেশের যাতে ক্ষতি না হয় সে বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে;
- সরকার নির্ধারিত স্থানে বর্জ্য ফেলতে হবে;
- পশু জবাইয়ের স্থান ভালভাবে ধৌত করে জীবাণুনাশক (ব্লিচিং পাউডার) ছিটাতে হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

জনসচেতনতায়: প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
প্রচারে: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

ত্রৈমাসিক
আমিষ বার্তা

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
২৩-২৪, বিএফডিসি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
www.flid.gov.bd